বিজ্ঞানের জন্মকথা

আবিষ্কারের কথা, পণ্ডিত মতিলাল, মহীয়সী মহিলা
প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স্
মাণিকতলা স্পার, কলিকাতা

ভাদ্র—১৩৩৯

এক টাকা

প্রকাশক—শ্রীকালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স, ২১, নন্দকুমার চৌধুরী লেন
প্রিণ্টার—শ্রীক্ষেত্রমোহন দালাল, কালিকা প্রেস, ২১, নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা

উপহার

—উপহারের বই—

বঙ্কিম-জীবনী—শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	৩৲
রামচন্দ্র—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর	...	১৲
লঙ্কেশ্বর—কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়	...	৷৶৹
গৌতমের গর্ভজন্ম—শ্রীনরেন্দ্র দেব	...	১৲
ভারতের পিতামহ—শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী	...	৷৶৹
ভারতের বীররাজা—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	...	১৷৹
আবিষ্কারের কথা—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	...	৷৷৹
বিদেশী পুরাণ—শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়	...	৸৹
জাপানী-উপকথা—শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল	...	৷৷৹
মেজদার ডায়েরী—শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়	...	১৷৷৹
কাব্যে-রবীন্দ্রনাথ—শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী	...	২৲
পণ্ডিত মতিলাল—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	...	৷৷৹
দেশবন্ধু স্মৃতি—শ্রীহেমন্তকুমার সরকার	...	৷৷৹
মহীয়সী মহিলা—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	...	২৲
স্কুলের মেয়ে—জাহান্‌ আরা চৌধুরী	...	৷৷৹
কৃষ্ণকুমারী—শ্রীভবেশ দাশগুপ্ত	...	৸৹
উৎস—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর	...	১৲
হিমালয়ের ডাক—শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়	...	৷৷৹

প্রকাশক

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স

২১, নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা

বিজ্ঞানের জন্মকথা

সূচীপত্র

গুহাবাসী-পরিবার

বিজ্ঞানের জন্মকথা

হাজার হাজার বছর আগেকার কথা। তখন না ছিল পৃথিবীতে আমাদের মত এমন ধরণের মানুষ, আর না ছিল পৃথিবীর এই রকম চেহারা।

অসংখ্য অতিকায় বন্য পশু দলে দলে ঘুরে বেড়াত—আর তাদের মধ্যে ক্বচিৎ অন্য ধরণের আর একরকম প্রাণীকেও ঘুরে বেড়াতে দেখা যেতো—সোজা হয়ে তারা হাঁটতে পারতো বটে কিন্তু গায়ে অন্যান্য পশুদের মতই ছিল বড় বড় লোম। তারাই হলো পৃথিবীর প্রথম মানুষ—বৈজ্ঞানিকদের মতে প্রায় আড়াই লক্ষ বছর আগে তারা এই পৃথিবীতে বসবাস করতো।

বনের পশুর মত তারা বনে বনে ঘুরে বেড়াত ; সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো তাদের ছেলে-মেয়েরা। জন্তুদের মাংস খেয়েই তারা জীবন-ধারণ করতো। হিংস্র প্রাণীদের মত তারা যেখানে পশুকে বধ করতো, সেইখানেই তার মাংস পেটপূরে খেয়ে নিতো—শুধু হাড়গুলো সঙ্গে করে নিয়ে আসতো গুহায় বসে ভাল করে খাবে বলে।

প্রথমে তারা খোলা আকাশের তলাতেই দিনরাত কাটাতো। যেখানে কাছাকাছি জল পাওয়া যেতো, সেইখানেই সাধারণতঃ

তারা থাকতো। সেই সময়কার হাওয়া ছিল ভয়ানক ঠাণ্ডা—আর বাইরে অতিকায় সব হিংস্র জন্তুদের উৎপাতও ছিল কম নয়। তাই আত্মরক্ষার চেষ্টায় অবশেষে তারা রাত্রিতে থাকবার জন্যে বা বিশ্রামের জন্যে গুহাতে আশ্রয় গ্রহণ করলো। সেই গুহা হলো মানুষের প্রথম ঘর।

আগে তারা তৃষ্ণার্ত্ত হলে, বনের পশুদের মত, ঝরণার ধারে গিয়ে মুখ ডুবিয়ে অথবা আঁচলা ভরে জল খেতো; কিন্তু যত দিন যেতে লাগলো, তত তারা তার অসুবিধে বুঝতে লাগলো। হাতের আঁচলায় ভাল করে জলকে তো ধরা যায় না। তোমরা আজ হয়ত ভাবতেই পারো না যে এটা কতবড় একটা বিপদের কথা—কেন না এখন হয়েছে লক্ষ লক্ষ রকমের পান-পাত্র। কিন্তু সেদিন সেই হাতের আঁচলা ছাড়া অন্য কোনও পান-পাত্রের খবর বা অন্য কোন কিছুরই খবর সেদিনকার মানুষনামধারী জীবগুলি জানতো না।

হঠাৎ একদিন ঘুরতে ঘুরতে নদীর ধারে দেখে বড় বড় সব শামুকের খোলা পড়ে রয়েছে। একটা কথা তোমরা বোধ হয় জানো—**Necessity is the mother of invention.** প্রয়োজন পড়লেই মানুষ আবিষ্কার করতে শেখে। হঠাৎ সেই সব বড় বড় শামুকের খোলা দেখে তাদের মনে হলো, এই তো পাওয়া গিয়েছে, এই খোলা করে তো জল খাওয়া যায়, ছেলেমেয়েদের জন্যেও তো নিয়ে যাওয়া যায়! তখন তারা

সুবিধে বুঝে সেই শামুকের খোলা নিয়ে পানপাত্র তৈরী করলো। সেই হলো মানুষের প্রথম পান-পাত্র।

তারপর কত বছর চলে গেছে—দিনের বেলায় সূর্য্যের আলোয় সারাদিন ঘুরে ঘুরে শিকার করে, আর রাত্রিবেলায় পর্ব্বতের গহ্বরে আশ্রয় নেয়। এর মধ্যে কতবার হিংস্র জন্তুদের সঙ্গে হয়ে গেছে ভীষণ ভীষণ যুদ্ধ। কারণ, যে গুহায় থাকতো পশুরা, তাদের তাড়িয়ে মানুষ এসে ঢুকলো সেখানে। তাদের অধিকারে এরকম ভাবে হস্তক্ষেপ করলে তারা সইবে কেন? তারাও অন্ধকার বুঝে গুহায় ঢুকে আক্রমণ করতে লাগলো। কখনও বা গুহার মধ্যে অন্ধকারে আগে থাকতে ওৎপেতে থাকতো, মানুষ ঢুকলেই তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তো। এমনিতর জীবন যাপন করবার ফলে, জগতের প্রথম মানুষের দল ক্রমশঃ অন্ধকারকে ভয় করতে শিখলো। স্বভাবতই তারা ভাবতে লাগলো কি করে এই অন্ধকারের ভয় থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়—সূর্য্য কেন সারাক্ষণ আকাশে থেকে আলো দেয় না? এমনি একটা কিছু পাওয়া যায় না—যার সাহায্যে সূর্য্য চলে গেলেও সব দেখা যাবে?

এমনিতর একেবারে আলোহীন কত রাত্রি ধরে জগতের প্রথম মানুষের দল ভয়ে জড়সড় হয়ে মনে মনে আলোর প্রার্থনা করেছে—নইলে বন্য জন্তুদের কাছ থেকে যে নিজেদের

রক্ষা করা যায় না। এমনিতর অন্ধকারের আশঙ্কায় যখন তাদের দিন কাটছিলো তখন হঠাৎ একদিন তারা এক রকম পাথরের সন্ধান পেলো—আর একটা পাথরের সঙ্গে ঘসতেই দেখে চিক করে আলোর মত কি বেরিয়ে এলো। ঠোকাঠুকি করতে করতে দেখে সেখানকার শুকনো পাতাগুলো হঠাৎ জ্বলে উঠলো—চারিদিক আলো হয়ে গেলো। অন্ধকারের হাত থেকে মুক্তি পাবার পথ হঠাৎ দেখতে পেয়ে নিশ্চয়ই সেদিন এক বিপুল আনন্দ তাদের চিত্তকে উদ্বেলিত করে তুলেছিল। মহোল্লাসে তারা সব একত্র জড় হয়ে রাশি রাশি শুকনো কাঠ আর পাতা দিয়ে সেই পাথর ঘষে আগুন তৈরী করলো। জগতের আলোহীন অন্ধকার রাত্রিতে মানুষের হাতে প্রথম আলো জ্বলে উঠলো।

প্রায় এক লাখ থেকে পঞ্চাশ হাজার বছরের মধ্যে এই সব লোকেরা পৃথিবীতে ছিল। বৈজ্ঞানিকরা এদের নাম দিয়েছেন —Neanderthal Men. এরা পাথরের ঢিল, বড় বড় গাছের ডালকে ভেঙ্গে লাঠী করে, অস্ত্রস্বরূপে ব্যবহার করতো। তা ছাড়া অন্য কোনও অস্ত্র তৈরী করতে এরা জানতো না।

এদের পরে যারা এই পৃথিবীতে ছিলো, তারা বহু হাজার বছর বসবাসের ফলে অনেক নতুন জিনিষ ব্যবহার করতে শিখেছিলো। তাদের বলে Paloeolithic যুগের লোক।

Palaios মানে হলো পুরাণো, lithos মানে হলো পাথর, যারা একেবারে পুরাণো ধরণের পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করতো তাদের বলে Paloelithic যুগের লোক। আগেকার লোকদের মত এরাও পাহাড়ের গুহায় গুহায় থাকতো আর শিকার করে খেতো। তবে আগেকার লোকেদের চেয়ে এরা আর একটু স্থিতিশীল হলো। যেখানে এরা থাকতো, সে যায়গাটার প্রতি ক্রমশঃ এদের মায়া বসলো। সব জন্তুর মাংস এরা খেতো না— ঘোড়ার মাংস খেতে এদের খুব ভালো লাগতো। খুব গভীর ভাবে খনন করার পর Solutre বলে একটা যায়গা থেকে প্রায় এক লক্ষ ঘোড়ার হাড় পাওয়া গিয়েছে। বৈজ্ঞানিকরা অনেক গবেষণার পর স্থির করেছেন যে, এই জায়গাটাতে সেই সময়কার বন্য লোকেদের একটা বাৎসরিক মেলা হতো— সেইখানে তারা প্রভূত পরিমাণে ঘোড়ার মাংস খেতো এবং দিনের পর দিন সেইসব হাড় স্তূপ হয়ে জমা থাকতো। ক্রমশঃ এই যুগের লোকেরা বুনো ঘোড়াকে বশ করতেও শিখেছিলো।

হয়ত প্রকৃতির চারিদিকে রঙের খেলা দেখে দেখে এদের মনে রঙ ব্যবহার করার কথা জাগে—তারা রঙের ব্যবহার করতে শিখলো। এদের আগেকার যুগের লোকেরা মানুষ মরে গেলে ফেলেই রেখে দিতো—এরা কিন্তু মৃতদেহকে কবর দিতে

শেখে। বাইরে ফেলে রাখলে বন্যজন্তুরা তাদের আত্মীয়-স্বজনের মৃতদেহ খেয়ে ফেলে দেখে—কোনও মানুষের মনে হয়ত দুঃখ হয়েছিল—সে-ই হয়ত প্রথম স্থির করে যে, মাটী খুঁড়ে মৃতদেহ রেখে দিতে হবে—তা হলে সহজে আর পশুরা খেতে পারবে না।

একটা খুব আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে এই Palœolithic যুগের লোকেরা খুব ভাল আঁকতে জানতো। ফ্রান্স আর স্পেনের দুই একটা পাহাড়ের গুহায় এই যুগের লোকের আঁকা ছবি পাহাড়ের গায়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। অধিকাংশই ঘোড়ার এবং সেই সময়কার বন্যপশুর ছবি। হাজার হাজার বছর আগে সেই সব অসভ্য লোকেরা পশুদের যে সব ছবি এঁকে রেখে গিয়েছে—বিশেষজ্ঞদের মত হচ্ছে যে সে রকম পশুদের ছবি আজকালকার খুব ভালো চিত্রকরেরাই আঁকতে পারেন। সেইজন্যে অনেকে বলেন যে জগতে যত কলাবিদ্যা আছে—তার মধ্যে চিত্রাঙ্কন বিদ্যাই হলো সকলের প্রথম। অসভ্য মানুষ যখন ভাষার প্রয়োজন জানতো না—তখন অবসরকালে শুক্‌নো ডাল দিয়ে সে আপনার মনে দাগ কাটতো—সেই দাগ-কাটা থেকে ছবি আঁকার সৃষ্টি হলো।

আজ থেকে কুড়ি হাজার বছর আগে, তারপর যে সব লোক এই পৃথিবীতে ছিল—তাদের বলে neolithic যুগের লোক। noeds মানে হলো নতুন, lithos মানে হলো পাথর।

আদিমকালের গুহা-চিত্র

[হাজার হাজার বছর আগে লোকেরা পাহাড়ের গুহায় ছবি এঁকে গিয়েছে]

যারা নতুন ধরণের পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করতে শিখলো তাদের বলে neolithic যুগের। এরা Paloelithic যুগের লোকদের চেয়ে সভ্য ছিল। এরা আর ঘোড়ার মাংস খেতো না—ঘোড়াকে বশ মানিয়ে তাদের কাজে লাগাতে শিখলো। আগেকার যে দুটো যুগের কথা বললাম, সে দুটো যুগেই মানুষ শিকার করেই খাদ্য সংগ্রহ করতো। এই যুগের লোকেদের সব চেয়ে বিশেষত্ব হলো যে, এরা শিকারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-কার্য্য শিখলো। কি করে অসভ্য মানুষ প্রথম কৃষি-কার্য্যের সন্ধান পেলো সে সম্বন্ধে অনেকে অনেক আলোচনা করেছেন। একটা সিদ্ধান্ত যেটা অনেকে ঠিক বলে মেনে নিয়েছেন—সেইটাই তোমাদের বলি।

তোমাদের আগেই বলেছি যে আগের যুগের মানুষরা মৃত-দেহকে কবর দিতে শিখেছিল। এই কবর দেওয়ার ব্যাপার থেকেই মানুষ প্রথম কৃষি-কার্য্যের সন্ধান পেলো।

কৃষি সম্বন্ধে প্রথম মানুষের দুটো জিনিব জানা দরকার ছিল—একটা মাটী খোঁড়া এবং মাটীর গুণ, আর একটা হচ্ছে বীজের ধারণা—ছোট্ট ছোট্ট বীজগুলো থেকেই যে অত বড় বড় গাছপালা হয়, এই জ্ঞান। আজকে মনে হয়—এ আর জানতে হবে কি! কিন্তু মানুষ যখন জগতের কোনও রহস্যের কিছুই জানতো না—তখন সেইটেই ছিল তার পক্ষে মস্ত বড় সমস্যা।

এখনও অনেক জাতির প্রথা আছে যে মৃত-ব্যক্তির সঙ্গে

কবরে খাদ্য-পানীয় ইত্যাদি দেওয়া। এই প্রথাটা চলে আসছে সেই আদিম বর্ব্বর যুগ থেকে। তারাও যখন তাদের আত্মীয়ের মৃতদেহ সমাহিত করতো তখন তার সঙ্গে ফল-ফুল, বুনো খাদ্য সব দিয়ে দিতো ;—কেননা তাদের ধারণা ছিল যে মানুষ একেবারেই মরে যায় না—সে আবার একদিন বেঁচে উঠবে। তাই তারা তার যা প্রিয় খাদ্য, কবরে তার মাথার কাছে রেখে দিতো। তারা মনে করতো এই যে মৃত্যু, এ যেন কিছু কালের মত ঘুমিয়ে পড়া! ঘুম শেষ হয়ে গেলেই আবার তারা জেগে উঠবে। খুব গভীর গর্ত্ত করবার যন্ত্র তখনও তারা তৈরী করতে শিখেনি। তাই অল্প মাটী খুঁড়ে তারা মৃতদেহ সমাহিত করতো। তারপর লক্ষ্য করে দেখে যে কবরের ওপর মাটী ফুঁড়ে ক্রমশঃ ছোট ছোট নানা রকমের গাছ জন্মাচ্ছে—কবরের মধ্যে যে-সব শস্য রাখা হতো, কালক্রমে সেগুলি থেকে যথানিয়মে গাছ বেরুতো। এই ভাবে বহুদিন লক্ষ্য করে তারা জানতে পারলো যে, মাটী খুঁড়ে মাটীর তলায় তারা যে সব বীজ বা ফল রাখতো—সেগুলিই ক্রমশঃ গাছ হয়ে উঠছে। এই থেকে মানুষ প্রথম কৃষির সন্ধান পেলো।

এই যুগের মানুষই প্রথম গহ্বর ছেড়ে থাকবার-জন্যে ঘর তৈরী করলো। শামুকের খোলা করে আর তাকে জল খেতে হতো না। মাটীর সঙ্গে পরিচয় হবার পর সে মাটী দিয়ে

নানা রকমের পাত্র তৈরী করতে শিখলো। ক্রমশঃ সে লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতুরও ব্যবহার শিখলো। এতদিন ধরে সে যে সব জিনিষ তৈরী করতো, সেটা কোনো রকমের কাজ-চলা গোছের হলেই হতো—ক্রমশঃ মানুষ সেই সব প্রয়োজনের জিনিষকে একটু সুন্দর করে গড়তে শিখলো। এমনি করে অসভ্য বর্ব্বর মানুষ দু লক্ষ বছর এই পৃথিবীতে বসবাস করবার পর ঘর-বাড়ী বেঁধে স্থির হয়ে বসলো।

ঘর বাড়ী বেঁধে মানুষ যখন পাকাপাকি ভাবে বসলো—তখন তার নতুন নতুন প্রয়োজন বাড়তে লাগলো—নতুন নতুন সমস্যা তার সামনে আসতে লাগলো। আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে, দিন-রাত্রি আলো-অন্ধকারের পরিবর্ত্তন দেখে—কখনও ঠাণ্ডা কখনও বর্ষা, কখনও গরম—ঋতুর এই নিত্য পরিবর্ত্তন অনুভব করতে করতে—তার মনে নতুন নতুন কথা জাগতে লাগলো—আপনার মনে সে প্রশ্ন করতে শিখলো, কেন এমন হয় ?

যতই তার প্রয়োজন বাড়তে লাগলো, ততই সে বুঝলে যে এই বিচিত্র পৃথিবীর চারিদিকে এমন সব জিনিষ লুকানো আছে—যার সন্ধান পেলে সে নির্ভাবনায় এই পৃথিবীতে বসবাস করতে পারে। যত তার প্রয়োজন বাড়ে, ততই বাড়ে তার খোঁজার তাগিদ্—কোথায় কি লুকানো আছে এই পৃথিবীর বুকে, নদীর জলে, পাহাড়ের গায়। যত খোঁজে ততই জাগে নতুন নতুন সমস্যা। ধর, নদীর ধারে একদল লোক জমি-জমা

ভাগ করে নিয়ে চাষবাস করে থাকে। হঠাৎ নদীতে এলো বন্যা—জমিজমা সব গেলো ভেসে। বন্যা নেমে গেলে দেখা গেলো যে, সকলের জমি এক হয়ে গেছে—কার কতটুকু জমি ছিল—কতদূর পর্য্যন্ত কার জমির সীমানা ছিল কি করে আবার তা ঠিক করা যায়? এই সমস্যার সম্মুখীন হ'য়েই মানুষ প্রথম মাপতে শিখলো—জ্যামিতির উদ্ভব হলো—সে কথা তোমাদের পরে বলছি।

এমনি করেই প্রয়োজনের তাগিদে ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের সৃষ্টি হলো! প্রথম যে-মানুষ রাত্রির অন্ধকারের ভয় দূর করবার জন্যে চকমকি ঠুকে আলো বার করেছিল আর আজ মার্কনী যিনি বিনা-তারে হাজার হাজার মাইল দূর থেকে কথাবার্ত্তা চালাবার যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন—এদের দুজনের মাঝখানে শত শত লোক সেই একই প্রয়োজনের তাগিদে অনবরত খুঁজে চলেছে—মানুষের কাছ থেকে কোথায় কি লুকিয়ে আছে, আকাশে, বাতাসে, সাগরে, মাটীতে! এই অবিরাম খোঁজার নামই বিজ্ঞান!

ব্যাবিলোন ও আসেরিয়া

এশিয়ার যে-অংশ আফ্রিকার খুব কাছাকাছি, সেইখানে আরবদেশের উত্তরদিকে টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস্ নদীর মাঝখানের জায়গায় প্রাচীন সভ্যতার দুটী বড় কেন্দ্র ছিল। একটার নাম হচ্ছে ব্যাবিলোন আর একটার নাম হচ্ছে আসেরিয়া। টাইগ্রিস্ নদীর উপর দিকের ভূমিকে বলতো আসেরিয়া—আর সেই নদীর নীচের দিকের নাম ছিল ব্যাবিলোন প্রদেশ। আসেরিয়ার রাজধানীর নাম ছিল নিনেভা আর ব্যাবিলোনের রাজধানীর নাম ছিল ব্যাবিলোন। ব্যবিলোনে যারা থাকতো তাদের বলতো Chaldean এখানে তোমাদের বলে রাখা দরকার যে আজকাল আমরা যেমন ভাষা ব্যবহার করি, আগেকার লোকেরা লেখবার সময় সে রকম ভাষা ব্যবহার করা জানতো না। তখনও বর্ণমালা তৈরী হয় নি। তারা ছবি এঁকে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতো। ধর, আলো যদি বোঝাতে হতো, তা হলে, তারা একটা সূর্য্য এঁকে দিতো—এই রকম। এই Chaldeanরাই ছবির অক্ষর ত্যাগ করে শব্দ-অনুযায়ী ভাষা প্রথম প্রচলিত করেন। কাদা দিয়ে তারা টালির মত মাটীর শ্লেট তৈরী করে তাইতে কাঁচা অবস্থায় লিখতো—এই ধরণের লেখাকে cuneiform লেখা বলে। স্যার হেনরী লেয়ার্ড নামে একজন ইংরাজ ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে

মাটী খুঁড়ে নিনেভা শহরের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ বার করেন। নিনেভা আর ব্যাবিলোন সম্বন্ধে যে সমস্ত খবর আজ আমরা জানি—তার জন্যে আমরা স্যার হেনরী লেয়ার্ডের কাছে ঋণী।

এই পুরাণো শহরের ধ্বংস খুঁড়ে একটা বিরাট সভ্যতার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। মাটীর তলায় সেই যুগের রাজার প্রাসাদে একটা লাইব্রেরী পাওয়া গিয়েছে। এখনকার মত বই তখন তো আর ছিল না—আস্ত আস্ত সব পোড়া মাটীর টালি—সেই হলো সেই সময়কার বই। এতে সেই সময়কার একটা ব্যাকরণ, আইন, ভূগোল, প্রাকৃতিক বিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে বই পাওয়া গিয়েছে। গ্রহ-নক্ষত্রদের খবর এরাই প্রথম জগৎকে দেয়।

ডানাওয়ালা সিংহের এক রকমের প্রতিমূর্ত্তি এখানে প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। এই সব প্রতিমূর্ত্তি এবং আরও অন্য যে সব জিনিষ পাওয়া গিয়েছে, তাতে বোঝা যায় যে এরা খুব ভালো ভাস্কর ছিল। এদের রাজপ্রাসাদের গঠনটীও ছিল বড় চমৎকার। এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যায় যে এরা বিশেষ পারদর্শী ছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এরা হাতের নানা রকমের কারুকার্য্যের কাজ জানতো। খুব ভালো কাপড় বুনতো এবং নানারঙ দিয়ে কাপড়ের পাড় তৈরী করার ব্যাপারে এরা প্রসিদ্ধ ছিল। এরা খুব ঐশ্বর্য্যশালী জাতি ছিল কারণ ঘরের আসবাব পত্র তৈরী করবার ব্যাপারে এদের যথেষ্ট বাহাদুরী দেখা যায়—প্রচুর ঐশ্বর্য্য না থাকলে এসব দিকে কারুর নজর পড়ে না।

আজকাল য়ুরোপীয়রা যেমন চেয়ার টেবিলে বসে খায়, এরাও তেমনি একরকম চেয়ার টেবিলে বসে খেতো। তবে আজকাল-কার তুলনায় এদের চেয়ার টেবিলগুলো দেখতে ঢের ভালো ছিল। তাই আজকাল অনেক বড় লোক নিজেদের বাড়ীতে সেই ধরণের সব চেয়ার টেবিল তৈরী করাচ্ছেন। আরব দেশের কার্পেট জগৎ-বিখ্যাত কিন্তু আরবদেরও পূর্ব্বে এরা সব চেয়ে ভালো কার্পেট তৈরী করে গিয়েছে।

জ্ঞানবিজ্ঞানের দিক দিয়ে অবশ্য তাদের ধারণা বড় বিচিত্র রকমের ছিল। তারা মনে করতো যে প্রকৃতির চারিদিকে অনবরত সমস্ত কুলক্ষণ বা সুলক্ষণ ফুটে. উঠছে—যেমন দিনের অমুক সময় অমুক দিক থেকে যদি পাখী উড়ে আসে, তাহলে রাজ্যের মঙ্গল হবে—পূজো দেবার সময় দেখা গেল যে দেবতার হাত থেকে একটা লাল ফুল পড়ে গেল—নিশ্চয়ই পূজারীর কোনও বিপদ হবে—এই সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করা এবং সেই সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ-বাণী করাই ছিল—তাঁদের জ্ঞানী লোকদের কাজ। এগুলো যে কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়, আজ আমরা তা বুঝতে পারি ; কিন্তু এ কথা মনে করো না যে, এর কোনও মুল্য ছিল না। যে-সমস্ত জ্ঞানী লোক প্রকৃতির মধ্যে এই সমস্ত লক্ষণ পাঠ করতেন—তাঁরা ধীরে ধীরে নিজেদের মনকে বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের উপযুক্ত করে গড়ে তুলছিলেন। কারণ, এই সমস্ত ব্যাপারে, ভবিষ্যৎ-বাণী করতে হলে—চারিদিকে যা ঘটছে তার প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হতো। এই রকম সূক্ষ্ম

দৃষ্টি নিয়ে প্রকৃতিকে দেখবার ফলে ধীরে ধীরে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার জন্ম হয়। প্রকৃতির রহস্যকে সেদিন তারা দৈব বলে মেনে নিয়েছিল। তাই কোনদিন বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে তার রহস্য ভেদ করতে তারা চায় নি।

আজকাল আমাদের জিনিষ মাপবার বা ওজন করবার একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রা আছে, যেমন ধর, ১২ ইঞ্চিতে এক ফিট বা ১৬ ছটাকে এক সের হয়; কিন্তু যে সময়ের কথা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সে সময় মাপ বা ওজনের একটা নির্দ্দিষ্ট কোনও মাত্রা ছিল না। যীশুখৃষ্ট জন্মাবার প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে হাম্মুরাবি বলে ব্যাবিলোনে একজন খুব বড় রাজা রাজত্ব করেন। তিনিই প্রথম আইন করে ওজন বা মাপের ব্যাপারে একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রা স্থির করে দিলেন। এই রকম ভাবে মাত্রা নির্দ্দিষ্ট হয়ে যাবার পর লোকের অঙ্ক কষবার সুবিধে হলো। আসেরিয়ার রাজা আসুরবানিপলের প্রাসাদ থেকে যে লাইব্রেরী পাওয়া গিয়েছে, তাতে গুণ-কষবার জন্যে নামতা পাওয়া গিয়েছে।

প্রাচীন মিশর

যে-সব প্রাচীন সভ্যতার সাক্ষাৎ নজীর পাওয়া যায়, তার মধ্যে আজ পর্য্যন্ত মিশরের সভ্যতাকেই প্রাচীনতম বলে ধরা হয়। এখানে তোমাদের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তবে

কি ভারতবর্ষ বা চীন, এর সভ্যতা প্রাচীনতম নয় ? এ প্রশ্নের কোন মীমাংসা হয় নি-এখানে সে সম্বন্ধে আলোচনা করারও প্রয়োজন নেই। আমার শুধু বক্তব্য যে সাক্ষাৎ ভাবে প্রাচীনতার প্রমাণস্বরূপ যে-সব ঘটনার তারিখ নিখুঁত ভাবে জানা গিয়েছে, তাতে আপাততঃ মিশরের সভ্যতাকেই প্রাচীনতম বলে ধরে নেওয়া হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ও আমরা এই প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতাম না। নেপোলিয়ান যখন দিগ্বিজয়ে বাহির হন তখন রসেটো নামক এক জায়গার মাটীর ভেতর থেকে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি একটা পাথর পান। এই পাথরে বিচিত্র সোজা সোজা লাইনে কি সব লেখা ছিল। তখন কেউ তার পাঠোদ্ধার করতে পারলো না। তারপর ১৮১২ খৃষ্টাব্দে Champollion নামে একজন ফরাসী পণ্ডিত তার পাঠোদ্ধার করে জানলেন যে, সেটা হচ্ছে প্রাচীন মিশরীয়দের ভাষায় লেখা একটা অনুশাসন।

মিশরের পিরামিডের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনে থাকবে। এই পিরামিডগুলো হলো প্রাচীন মিশরীয় রাজাদের কবর। বহুদিন ধরে মানুষ চেষ্টা করছে, পিরামিডের ভেতর কি আছে জানবার জন্যে। বহু চেষ্টার পর প্রাচীন মিশরীয় রাজাদের এইসব কবরের ভেতর ঢুকে মানুষ যে সব ছবি আর আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিষ দেখতে পেলে তাতে জগৎ বিস্মিত হয়ে গেল

এখানে তোমাদের প্রাচীন মিশরীয়দের একটা মজার প্রথার কথা বলি। যখনি কোনও সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ীতে ভোজ হত, তখনি ভোজ আরম্ভ হবার আগে কয়েকজন ভৃত্য সমাগত অতিথিদের সামনে একটী মৃত-ব্যক্তির পুতুল নীরবে বহন করে নিয়ে যেতো। তার অর্থ এই যে, আনন্দের মাঝখানে আমরা ভুলে না যাই যে আমাদের জীবনের শেষ পরিণাম হলো মৃত্যু।

রাজা মহারাজা থেকে সাধারণ লোক পর্য্যন্ত সবাই তারা মৃত্যুকে খুব বড় করে দেখতো। তাই রাজারা বেঁচে থাকতে থাকতেই তাঁদেরই কবর তৈরী করতেন এবং তাঁরা যে ঘরে প্রতিদিন রাত্রে বিশ্রাম করতেন সে ঘরটাকে যতখানি না সাজাতেন, তার চেয়ে বেশী যত্ন নিয়ে সাজাতেন, যেখানে তাঁদের দেহ মৃত্যুর পর থাকবে।

তাই প্রাচীন মিশর বিলুপ্ত হয়ে গেলেও, এই সব কবর থেকে তাদের অতীতের সাক্ষী স্বরূপ বহু জিনিষ পাওয়া গিয়েছে এবং পিরামিডের গঠন এমন আশ্চর্য্য কৌশল করা হয়েছিল যে, তার ভিতরকার জিনিষ বিনষ্ট না হয়ে, ঠিক সেই রকম ভাবেই আছে।

এই সমস্ত কবর থেকে যে সব জিনিস পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বিজ্ঞানের নানাবিভাগে মিশরীয়রা উন্নত ছিল। পিরামিডের ভিতর দেওয়ালে ধনানারকমের অপূর্ব্ব গঠন পাত্রের গায়ে যে সব ছবি দেখতে

পাওয়া গিয়েছে তার কোনটাতে দেখা যায় যে একদল লোক কোথাও পাথর কাটছে, কোথাও ছুতোর মিস্ত্রীর দল কাজ করছে, কোথাও বা কুমোর মাটীর পাত্র তৈরী করছে, মুজুররা পা দিয়ে বাড়ী-তৈরী-করবার মশলা মাখছে, এমনি ভাবে—স্বর্ণকার, মুচী, তাঁতি, কাঁচের-জিনিষ-তৈরী-করা, রঙ-তৈরী-করা, মণিকার, ডাক্তার, বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সব ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

ফিনিসিয়া

আফ্রিকার উত্তর উপকূলে ভূমধ্যসাগরের ধারে ছিল ফিনিসিয়া। ফিনিসিয়ার প্রধান নগরের নাম ছিল কার্থেজ। এই ফিনিসিয়াবাসীরা নৌ-বিদ্যা খুব ভাল জানতো। অতি প্রাচীন কালে এরা নৌকো নিয়ে ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে আটলাণ্টিক সাগরে পাড়ি দেয়। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল এরা নৌকো নিয়ে পরিক্রমণ করে। এরা নৌকো করে স্পেন, ফ্রান্স এবং উত্তর য়ুরোপের অন্যান্য দেশেও বাণিজ্যের জন্যে আসতো। খনিজ দ্রব্য বা ধাতুর ব্যবসায়ে ছিল এরা অদ্বিতীয়। স্পেনে সেই সময় প্রচুর পরিমাণে সোণা, রূপা, টিন, লোহা, তামা, সীসে প্রভৃতি পাওয়া যেতো—তাই এরা স্পেন দেশ থেকে সে সব সংগ্রহ করে মেসোপটেমিয়ায় এসে বিক্রী করতো। এদের ব্যবসার মধ্যে দিয়েই সেদিন য়ুরোপ আর এশিয়া

মিলিত হয়। এশিয়ার জিনিষ নিয়ে য়ুরোপের দেশে বিক্রী করতো—য়ুরোপের জিনিষ নিয়ে এশিয়ায় বিক্রী করতো। এই ভাবে য়ুরোপ আর এশিয়া এই ফিনিসিয়ান বণিকদের মধ্যে দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে জানে।

এদের আর একটা গুণ ছিল—এরা জগতে প্রথম কাঁচের জিনিষ তৈরী করে। ফিনিসিয়াবাসীরা বিশ্বাস করতো যে মানুষের জীবনের সঙ্গে গ্রহনক্ষত্রের একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। তারা সেই জন্যে গ্রহনক্ষত্রের পূজা করতো এবং সেই পূজায় তারা একান্ত বর্ব্বরের মত ছোট ছোট ছেলে সব আগুনে আহুতি দিত। ইতিহাসে নজির আছে যে কার্থেজবাসীরা একবার শনিগ্রহকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে দুশো শিশু আগুনে আহুতি দেয়! যারা অন্যদিকে এত সভ্য ছিল—তাদের মধ্যে এই বর্ব্বর প্রথা যে কি ভাবে ছিল—তা ভাবতে বিস্ময় লাগে।

বর্ত্তমানে যেখানে প্যালেষ্টাইন আছে তারই কাছাকাছি যায়গায় হিব্রুরা বাস করতো। এরা মিশর বা ফিনিসিয়াবাসীদের মত কর্ম্মী লোক ছিল না—ব্যবসা-বাণিজ্য বা জিনিষ-পত্র তৈরী করার ব্যাপারে এরা জগতে বিশেষ কিছুই দিতে পারে নি। এরা ছিল ধর্ম্মপ্রাণ, ভাবুক জাতির লোক। সেই জন্যে তারা জগতে সাহিত্যের দিক দিয়ে একটা অমূল্য জিনিষ দিয়েছে—সে হচ্ছে বাইবেল।

প্রাচীন য়ুরোপ

প্রাচীন য়ুরোপীয় সভ্যতা বলতে গেলে প্রাচীন গ্রীস আর রোমের কথাই ওঠে। সে-কথা পরে বইএর মধ্যে বলা হবে বলে এখানে আর বললাম না। কিন্তু সম্প্রতি ঐতিহাসিকরা ক্রীট দ্বীপের মাটী খুঁড়ে আরও প্রাচীনতর এক সভ্যতার খবর পেয়েছেন। সেই সভ্যতাই নাকি প্রাচীন গ্রীসের সভ্যতার জনক। কিন্তু এ বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ হয়েছে মাত্র ১৯০০ সালে। সুতরাং এখন এ বিষয় সম্বন্ধে স্থিরভাবে কিছু সিদ্ধান্ত গড়বার অনেক দেরী আছে। তবে হোমার তাঁর মহাকাব্যে যে ট্রয় নগরের কথা লিখেছেন—মাটীর ভেতর থেকে তার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে—রাজা Agamemnonএর কবর আর প্রাসাদও পাওয়া গিয়াছে। ক্রীটের মাটী খুঁড়ে যে সব জিনিষ পাওয়া গিয়েছে তাতে জানা যায় যে চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য্য, অস্ত্র-নির্ম্মাণ, জল-নিষ্কাশন-প্রণালী প্রভৃতি বিদ্যায় এখানকার অধিবাসীরা খুব পারদর্শী ছিল।

এক, দুই, তিন, চার

তোমরা বোধ হয় জানো বিজ্ঞান বুঝতে হলে বা জানতে হলেই অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞান থাকা চাই। অঙ্কশাস্ত্র ছাড়া বিজ্ঞান এক পা চলতে পারে না।

বিজ্ঞানের ইতিহাসেও তাই দেখা যায় মানুষ সর্ব্ব-প্রথম এই অঙ্কশাস্ত্র নিয়েই ব্যস্ত। মানুষ কি করে প্রথম গুণতে শিখলে ? আমরা যেমন নিয়মিত ভাবে আজ সংখ্যার ব্যবহার করি—বহুদিন লেগেছিল জগতের আদিম অধিবাসীদের একটা নিয়মিত ধারাবাহিক সংখ্যা সৃষ্টি করতে ; যার সাহায্যে যত জিনিষ হোক সে গুণে একটা স্থির নাম দিতে পারে। এ বিষয়ে প্রাচীন হিন্দুরা জগতে সকলের আগে একটা বিশেষ বৈজ্ঞানিক পারদর্শিতা লাভ করেন।

প্রাচীন জগতের অসভ্য লোকেরা কি করে গুণতো তার একটা বর্ণনা একখানা বই থেকে তোমাদের জানাচ্ছি—বইটীর নাম যদি মনে করে রাখতে চাও—তা হলে বলি, বইটীর নাম হচ্ছে Primitive Culture লেখকের নাম হচ্ছে, E. B. Tylor. এই বইতে এক যায়গায় লেখক বলছেন—১ থেকে মাত্র ৪ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছিল। অর্থাৎ তারা ১, ২, ৩, ৪ এই চারটী সংখ্যা জানতো। যখন ৫ বোঝাবার তাদের দরকার হতো তখন তারা আর সংখ্যা ব্যবহার করতো না—তাই ৫ বোঝাতে হলে তারা বলতো amgnaitone. অনুবাদ করলে এর অর্থ হয়—"একটা পূরো হাত"—একটা হাতে পাঁচটা আঙুল ;

সুতরাং একটা পুরো হাত বল্লেই ৫ বোঝাতো। ৬ বোঝাতে হলে তারা বলতো itacono amgnapana teirnitpe অনুবাদ করলে কথাটার মানে দাঁড়ায়—"অন্য হাতের আর একটা" অর্থাৎ একটা হাতের পাঁচটা আঙুল, আর অন্য হাতের একটা—এই হলো ৬। এমনি করে তারা ৯ পর্য্যন্ত বলতো। ১০ বোঝাতে হলে তারা বলতো amgna aceponore মানে দুটো হাতই। তারপর ১১ বোঝাতে হলে তারা বলতো দুটো হাত আর পায়ের একটা। এমনি করে হাত আর পায়ের আঙুলের উল্লেখ করে তারা ১৯ পর্য্যন্ত গুণতো। ২০ বোঝাতে হলে—তারা তাদের জাতির নাম করে একটা শব্দ ব্যবহার করতো—তার মানে "পূরো মানুষ"। ২১ বোঝাতে হলে তারা বলতো আর একটা মানুষের একটা, মানে একটা মানুষের কুড়িটা আঙুল আর একটা মানুষের একটা আঙুল—এই হোল ২১। এমনি করে একটা মানুষের যায়গায় ২, ৩, ৪ বলে তারা ১০০ পর্য্যন্ত গুণতো।

এই অসভ্য মানুষদের গণনার প্রথা থেকে ব্যাবিলোনবাসীরা সর্ব্বপ্রথম এঁকক দশকের দ্বারা সংখ্যার একটা নিয়ম বার করেন এবং তাঁরা পাটিগাণিতের অনেক প্রাথমিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন।

ব্যাবিলোনবাসীরা ছিল ব্যবসায়ী জাতি। ব্যবসা করতে গেলেই সংখ্যার প্রয়োজন সর্ব্বপ্রথমে আসে। সংখ্যা আর ওজনের ব্যাপার না জানলে ব্যবসার যে বিশেষ অসুবিধে

হয়—একথা তোমরা নিশ্চয়ই বোঝ। সেইজন্য সংখ্যার প্রচলন ব্যাবিলোনবাসীদের মধ্যেই প্রথম দেখা যায়। ব্যাবিলোন-বাসীরা ১ লিখতো ➤— এই চিহ্ন দিয়ে; এই চিহ্নটাকে শুয়ে দিলেই হতো দশ; একের চিহ্নের পর দশের চিহ্ন দিয়ে তারা ১০০ লিখতো।

জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যাবিলোনবাসীরা সর্ব্বপ্রথম ৩৬৫র কাছা-কাছি দিনে বৎসর গণনার প্রবর্ত্তন করে। তারা গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করে কয়েক শ'বছর পরের গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান নিরূপণ করে পঞ্জিকা তৈরী করে। আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে সাতটা গ্রহের নামে ৭ দিনে সপ্তাহ তারাই প্রথম স্থির করে।

পাটীগণিতে তারা Sexagesimal system, tables of square and cubes, arithmetical and geometric progression জানতো। তারা দশক শতকের উর্দ্ধে—অর্থাৎ সহস্র, দশ সহস্র, শত সহস্রের প্রভৃতি সংখ্যার ব্যবহার জানতো।

নিয়মের রাজ্য

নীলনদের ধারে থাকতো মিশরীয়রা। নদীর বন্যায় প্রায়ই জমিজমা ভেসে যেতো। বন্যা থেমে গেলে দেখা যেতো যে প্রত্যেকের জমির সীমানা সব নষ্ট হয়ে গেছে। রাজ-কর্ম্মচারীদের কর বসাতে অসুবিধে হতো—কার কতটুকু জমি, সেই হিসাবে তো কর বসবে! এই অসুবিধে দূর করবার জন্যেই মিশরে **geometry**র উদ্ভব হয়। **geo** মানে পৃথিবী **metria** হলো মাপ। যখনই কোনও বন্যা হতো বা লোকের জমি-জমার সীমানা নিয়ে গোলমাল হতো তখনই রাজসরকার থেকে একজন জ্যামিতি-জানা-লোক পাঠান হতো—তিনি গিয়ে জমি মেপে আবার সীমানা স্থির করে দিতেন।

তোমরা জানো যে মাটী খুঁড়ে বা পিরামিডের ভেতর থেকে প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে অনেক খবর জানা গিয়েছে। একটা যায়গা থেকে একটা খুব পুরাণো কালের—যিশুখৃষ্ট জন্মাবার প্রায় দুহাজার বছর আগেকারে একখানি অঙ্কের বই পাওয়া গিয়েছে। আপাততঃ এই বইখানিই হচ্ছে জগতের সব চেয়ে পুরাণো লিখিত অঙ্কশাস্ত্রের বই। এই বইখানি ইংলণ্ডের বিখ্যাত লাইব্রেরী বৃটীশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য করে থাকবে যে মানুষের মধ্যে দু রকমের লোক দেখা যায়—এক রকমের লোক হচ্ছে হিসেবী, যেটুকু জানা বা করা প্রয়োজন তার বেশী তারা ভাবে না, কল্পনাও করে না; আর এক রকমের লোক হচ্ছে—ভাবুক,

তারা হিসেবের অত ধার ধরে না—তারা নিজেদের চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত। মিশরীয়রা ছিল প্রথম ধরণের লোক—হিসেবী, যাকে বলে একেবারে কাজের লোক—কল্পনার বিশেষ কিছু ধার ধারতো না তারা। আর মিশরীয়দের পর যারা সভ্যতাকে নতুন জীবন দিলো—অর্থাৎ গ্রীকরা—তারা যেমন কাজও করতে জানতো—তেমনি কল্পনাও করতে পারতো। মিশরীয়দের মত অত হিসেবী তারা ছিল না বটে; কিন্তু তাদের মত কর্ম্মকুশল শক্তিশালী জাতি জগতে খুব কমই হয়েছে। আর এটা তোমরা লক্ষ্য করে থাকবে যে, যে যত ভাবুক হয়, তার মনে তত নানা রকমের প্রশ্ন ওঠে—কেন এটা হয়? কেন ওটা হয়? এর মানে কি? এর সঙ্গে ওর সম্বন্ধ কি?

মিশরীয়রা এসব প্রশ্নের ধার ধারতো না—তাই তারা জগতে যে-সব জিনিষ দিয়ে গিয়েছে সেগুলোর সঙ্গে মানুষের প্রতিদিনের সাক্ষাৎ যোগই বেশী—যেমন বাড়ী তৈরী করার বিদ্যা, জমি-মাপা, পাটীগণিতে Rule of three, কেন না Rule of three হিসেবী লোকের বিশেষ প্রয়োজন, রঙ-তৈরী করা, রসায়ন-বিদ্যা, ডাক্তারী প্রভৃতি। মিশরীয়রা যে খুব বড় এঞ্জিনীয়ারের জাতি ছিল তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ এখনও আফ্রিকার মরুভূমির মধ্যে সাক্ষী হয়ে সগর্ব্বে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাচীন মিশরের তৈরী পিরামিড আজও জগতের বিস্ময়। এই পিরামিডের গঠন লক্ষ্য করলে বেশ বোঝা যায় যে, যারা এই সব বিরাট কবর সৃষ্টি করেছিল তারা খুব ভাল

রকম জ্যামিতি ও এঞ্জিনীয়ারিং জানতো। এই পিরামিড যারা তৈরী করেছিল তারা উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব্ব-পশ্চিম হিসেবে দিক ভাগ করতে জানতো। এই দিক্-জ্ঞান থাকা তাদের একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল কারণ সে দেশটার চারদিকে ছিল মরুভূমি। অনবরত বালির ঝড়ে দেশের চেহারা বদলে বদলে যেতো—মরুভূ প্রদেশে সেই জন্যে দিক ঠিক করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। মরুভূ-প্রদেশে থাকার দরুণ তাদের দিক ঠিক করে রাখার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এবং এই দিকগুলোর দিকে বিশেষ নজর রেখেই তারা পিরামিড তৈরী করে।

খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় চার হাজার বছর আগেকার একজন মিশরীয় ডাক্তারের নাম পাওয়া গিয়েছে—তাঁর নাম হচ্ছে—I-em-hetep, ইংরেজীতে এই নামের অর্থ He who Cometh in Peace অর্থাৎ যিনি আসেন শান্তি নিয়ে। সম্প্রতি মেম্ফিস্ শহরের কবর খুঁড়ে একটা ছবি পাওয়া গিয়েছে—তাতে দেখা যায় যে ডাক্তার একজন রুগীকে অস্ত্রোপচার করছেন।

রঞ্জন-বিদ্যা অর্থাৎ রঙ-তৈরী-করা, বর্ত্তমান Chemistry-র যা একটা প্রধান অঙ্গ—তা তারা খুব ভাল রকমই জানতো। যদি কোন দিন তোমরা প্রাচীন মিশরের কবর থেকে খুঁড়ে যে সব জিনিষ পাওয়া গিয়েছে—তার প্রতিচ্ছবি দেখো—তা হলে দেখতে পাবে, কি পাকা রঙ তারা ব্যবহার করতো—যেন মাত্র কালকে সেগুলোকে রঙ লাগান হয়েছে। তোমরা শুনে বিস্মিত হবে যে প্রাচীন মিশরীয়রা সাবানও তৈরী করতে

জানতো। অনেক পণ্ডিতের মত যে "Chemistry" কথাটা প্রাচীন মিশর থেকেই এসেছে। মিশরের গাছ-গাছড়ার দেবতা "Khem"র নাম থেকেই নাকি "Chemistry" শব্দের উদ্ভব।

এই সব কাজের লোকের পর এলো প্রাণভরা কল্পনা নিয়ে, গ্রীকরা। তোমরা ইংরাজ মহাকবি শেলীর নাম হয়ত শুনে থাকবে, তিনি বলতেন—We are all Greeks, our laws, our literature, our religion, our art have their roots in Greece. আমরা সবাই গ্রীক, আমাদের আইন-কানুন, সাহিত্য, ধর্ম্ম, শিল্পকলা সকলের উৎপত্তি-স্থল হচ্ছে গ্রীস।

একথা ঠিকই যে প্রাচীন গ্রীস থেকেই বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্ম। আগেই বলেছি ব্যাবিলোনবাসীরা বা মিশরীয়রা তাদের কাজের জন্যে যেটুকু বিজ্ঞান দরকার, তাই নিয়েই নাড়াচাড়া করতো—কিন্তু বিজ্ঞানের আর একটা দিক আছে এবং সেইটেই হলো বিজ্ঞানের ভিত্তি। সে দিকটার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে আমাদের প্রয়োজনের কোনও যোগ নেই। সেটাকে নিয়মের দিক বলা যেতে পারে। কি নিয়মে সমস্ত জিনিস ঘটছে, কোন কাজের সঙ্গে কোন কারণের কি যোগ, সেই সব তত্ত্ব নিরূপণ করা হলো বিজ্ঞানের প্রধান কাজ। সূর্য্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে—না পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে—এ ব্যাপারটা জানার সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের জীবনের কোনও সাক্ষাৎ যোগ নেই—এ খবরটা না জানলেও জীবন চলে যায়; কিন্তু এ খবরটা স্থির করে না জানলে বিজ্ঞান চলতে পারে না।

এতদিন পর্য্যন্ত যাঁরা বিজ্ঞান সাধনা করে এসেছিলেন তাঁরা এ সব ব্যাপার নিয়ে, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দিক নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাননি। গ্রীকরা এসে প্রথম জগতে প্রচার করলো যে, এই যে সূর্য্য উঠে, আলো দেয়, তারপর আসে চাঁদ রূপালী আলো ছড়িয়ে, এই যে প্রকৃতি আর তার অসংখ্য খেয়াল, কখনও উঠছে ঝড়,কখনও আসছে বৃষ্টি,কখনও উত্তাপে পুড়ে যাচ্ছে পৃথিবীর বুক ; এই যে পৃথিবী, তার নদনদী সমুদ্র পর্ব্বত, মাথার ওপরে ঐ যে তারারা নিত্য সন্ধ্যায় মিট-মিট করে জ্বলে ওঠে, চারিদিকে এই যে বীজ থেকে গাছ জন্মায়—সেই গাছ আবার ভরে উঠে ফলে ফুলে,—এই সমস্ত আপনা থেকেই আপনি হচ্ছে না—এই সমস্তর পেছনের একটা বাঁধা-বাঁধি নিয়ম আছে—যার একচুল একদিক ওদিক হবার জো নেই। সে নিয়মকে মানুষ যত দিন না জানতে পারবে,—বুঝতে পারবে ততদিন তার জ্ঞান-সাধনারও বিরাম নেই।

এইটেই হলো বর্ত্তমান বিজ্ঞানের অন্তরের কথা—সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে একটা স্থির আর নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে যেমন নিয়মের বশে এক আর একে দুই হয়, ঠিক সেই রকম নিয়মের বাঁধনে সমস্ত সৃষ্টি চলছে। গ্রীস এসে সেই কথাই প্রচার করলো এবং সেই কথা প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের আসল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হলো।

গ্রীসের প্রথম বড় বৈজ্ঞানিক

গ্রীসের প্রথম যে বড় বৈজ্ঞানিকের নাম আমরা পাই—তাঁর নাম হচ্ছে থেল্‌স্‌। গ্রীসের সাতজন সব চেয়ে বড় পণ্ডিতের মধ্যে থেল্‌স্‌কে একজন বলে ধরা হয়।

এখন যেটাকে আমরা বলি এশিয়া মাইনর, পুরাকালে সে প্রদেশটী গ্রীসের অধীন ছিল। এই এশিয়া মাইনরে আইওনিয়া বলে একটা দেশ ছিল। আইওনিয়ার অন্তর্ভুক্ত নিলেটাস নগরে খৃষ্ট জন্মাবার ৬২৪ বৎসর আগে থেল্‌স্‌ জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের প্রথম দিকে তিনি এঞ্জিনীয়ারের কাজ করতেন।

এঞ্জিনীয়ারিং ছেড়ে থেল্‌স্‌ নুন আর তেলের ব্যবসায় করতে আরম্ভ করেন। এই ব্যবসায় দরুণ তাঁকে প্রায়ই মিশরে আসতে হতো। ব্যবসায় করতে আরম্ভ করলে কি হবে? তাঁর মনে জ্ঞানের পিপাসাই সব চেয়ে তীব্র ছিল। তিনি মিশরের পুরোহিতদের কাছে জ্যোতির্বিদ্যা আর জ্যামিতি শিখতে লাগলেন এবং নিজের প্রতিভার বলে তিনি জ্যোতির্বিদ্যা আর জ্যামিতিতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করলেন।

তেল আর নুনের ব্যবসায় ছেড়ে তিনি আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলেন। অনেকদিন ধরে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, অমুক বছর অমুক সময়, দিন হঠাৎ রাত হয়ে যাবে, সূর্য্যকে সেদিন আর দেখা যাবে না, চাঁদেতে তার আলো ঢাকা পড়ে যাবে।

লোকে তখন থেল্‌সের কথা বুঝতে পারলো না—কারণ সূর্য্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের ব্যাপার তখন লোকে জানতো না।

ঠিক যে বছরে সূর্য্যগ্রহণ হবে বলে থেল্‌স্‌ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেই বছরে এশিয়া মাইনরে গ্রীসদের মধ্যে একটা ঘরোয়া যুদ্ধ সুরু হয়। যুদ্ধ চলছে এমন সময় হঠাৎ একদিন সৈন্যরা দেখলো যে দিবা দ্বিপ্রহরে রাত্রির মত অন্ধকার নেমে এল, সূর্য্য গেল অদৃশ্য হয়ে। তখন হঠাৎ সকলের মনে পড়লো, থেল্‌সের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা। উভয়-পক্ষের সৈন্যরা এতদূর বিমূঢ় হয়ে গেল যে, তারা আর যুদ্ধ না করে, আপোষে মিটমাট করে নিল।

থেল্‌স্‌ জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম বৎসরকে ৩৬৫ দিনে ভাগ করেন এবং তাঁর আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যের মধ্যে আর একটী প্রধান বিষয় হচ্ছে যে, তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন যে চাঁদ সূর্য্যের আলোতেই আলোকিত।

থেল্‌সের আকাশের তারা দেখা সম্বন্ধে একটা গল্প চলিত আছে। একবার তিনি আকাশের তারা দেখতে দেখতে এক কূপের ভেতর পড়ে যান। সেইখানে থ্রাটা বলে তাঁর পরিচারিকা উপস্থিত ছিল। সে লোকজন ডেকে থেল্‌স্‌কে কূপের ভেতর থেকে তুলে পরিহাস করে বলেছিল, আকাশে কি আছে দেখতে বিভোর হয়ে, উনি পায়ের তলার পৃথিবীতে কি আছে দেখতে পান না—**In his zeal**

for things in the sky he does not see what is at his feet—সেই থেকে এই কথাটা প্রবাদ হয়ে গেছে—যখনি মানুষ দূরের সম্ভাবনায় কাছের জিনিষকে ভুলে যায়, তখনই এই প্রবাদটী ব্যবহৃত হয়।

আগেই বলেছি যে থেল্‌স্ মিশরের পুরোহিতদের কাছ থেকে জ্যামিতি শেখেন। কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে জ্যামিতি শিখে তিনিই আবার তাদের শেখান। তাঁর জ্যামিতি-জ্ঞানের জন্যে সেই সময়কার মিশরের রাজা আমাসিস্ তাঁকে বড় ভালবাসতেন। জ্যামিতির সাহায্যে রাজা এবং পুরোহিতদের সামনে পিরামিডের ছায়া মেপে পিরামিডের দৈর্ঘ্য কত তিনি বলে দিলেন। সেই থেকে মিশরের রাজদরবারেও তাঁর খ্যাতি যথেষ্ট হয়। বর্ত্তমানে স্কুলে ইউক্লিডের জ্যামিতিতে আমরা যে-সব Theorem পড়ি, তার কতকগুলি থেল্‌সের রচনা।

The angles at the base of an isocceles triangle are equal ;

When two straight lines cut each other the opposite angles are equal ;

The circle is bisected by i.s diameter—এই Theoremগুলি থেল্‌সের রচনা।

কিন্তু এই পৃথিবী কি রকম ভাবে আছে, এর সঙ্গে অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের কি সম্বন্ধ—সে বিষয়ে থেল্‌সের কোন সঠিক ধারণা ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে

আমাদের এই পৃথিবী জলে ভাসছে—জলই হচ্ছে সৃষ্টির আদি-কারণ। এখানে একটা জিনিষ লক্ষ্য করবার আছে। এর আগে লোকের সৃষ্টি সম্বন্ধে এই ধারণা ছিল যে, এই পৃথিবী তার গাছপালা, নদ-নদী সবই দেবতাদের সৃষ্টি। এ হলো মানুষের ধর্ম্ম-বিশ্বাস। কিন্তু এই ধর্ম্ম-বিশ্বাস নিয়ে বিজ্ঞান চলতে পারে না। বিজ্ঞানে কোনও দৈব ব্যাপার নেই। এই দৈব-ব্যাপারকে বাদ দিয়ে, আসল বস্তু নিয়ে, কেন সে হলো, কোথা থেকে হলো, কি দিয়ে সে তৈরী হলো, কেমন করে তৈরী হলো, এই সমস্ত প্রত্যক্ষ বস্তুবিচার হলো বিজ্ঞানের কাজ। সেইজন্যে এই দিক দিয়েও বলা যায় যে, যখন থেল্‌স্‌ বললেন, দৈব ইচ্ছা নয়, জলই হলো সৃষ্টির প্রথম এবং একমাত্র উপাদান অথবা মূল কারণ, তখন বলা যায় যে তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক যিনি বস্তুর প্রত্যক্ষ বিচার করে সৃষ্টির রহস্য সমাধান করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য এ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা সর্ব্বৈব ভুল ছিল। তাঁর ধারণা ছিল যে সূর্য্যের তেজে জল বাষ্প হয়ে বায়ুতে পরিণত হয়—আর পৃথিবী যে সমুদ্রের ওপর ভাসছে—সেই জল যখন নড়ে ওঠে তখন ভূমিকম্প হয়—আমাদের দেশে আগে যেমন লোকে বিশ্বাস করতো যে বাসুকীর ফণার ওপরে পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে—এক ফণা থেকে যখন বাসুকী পৃথিবীর ভার অন্য ফণায় নেন তখন ভূমিকম্প হয়।

হিপোক্রেটিসের শপথ

থেল্‌সের পর গ্রীকদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক হিসাবে যে লোকটীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—তাঁকে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-শাস্ত্রের জনক বলা হয়। তাঁর নাম হচ্ছে—হিপোক্রেটিস্।

হিপোক্রেটিসের আগে লোকে ডাক্তারীর ব্যাপারে দৈবকেই আশ্রয় করে চলতো—অসুখ হলে দেবতাকে পূজা দেওয়া, পুরোহিতদের কাছ থেকে মাদুলী নেওয়া, কোন কোন ক্ষেত্রে গাছ-গাছড়া ব্যবহার করা—এই ছিল তখনকার চিকিৎসা-শাস্ত্র। রোগের কারণ বিচার করে, শরীরের ভেতরের গঠন বা ক্রিয়াকার্য্য জেনে—বৈজ্ঞানিক উপায়ে রোগের চিকিৎসা করা প্রাচীন য়ূরোপে হিপোক্রেটিস্ প্রথম প্রবর্ত্তন করেন।

বর্ত্তমান চিকিৎসা-শাস্ত্রের অনেক মূল কথা আমরা হিপোক্রেটিসের কাছ থেকেই পেয়েছি। তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন যে, রোগ কখনও দৈব হতে পারে না, শরীরের ভেতরে কোনও স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমের ফলেই রোগ জন্মায়, সুতরাং রোগ-নিবারণ করতে হলে প্রথমে জানা চাই শরীরের গঠন এবং কি কারণে সেই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে রোগের গতি লক্ষ্য করে তা স্থির করা।

তোমরা জানো যে অনেক সময় ডাক্তাররা রুগীদের স্বাস্থ্যকর যায়গায় বায়ু-পরিবর্ত্তনের কথা বলেন। তার কারণ হচ্ছে, আজকাল এটা প্রমাণ হয়ে গেছে, আমাদের দেহের মধ্যে এমন কতকগুলি গুণ আছে যে, একটু অনুকুল অবস্থার

মধ্যে থাকলে, তার দ্বারা আমরা আপনা থেকে আরোগ্যলাভ করতে পারি। মানুষের শরীরের এই যে স্বাভাবিক শক্তি—হিপোক্রেটিস্ তার খবর প্রথম জগৎকে জানান। তাঁর লিখিত ডাক্তারী বইগুলির নাম থেকে বোঝা যায় যে তিনি প্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রোগের শ্রেণী-বিভাগ করেন। যে বইগুলি নিঃসন্দেহভাবে জানা গিয়েছে যে তাঁর লেখা সেগুলির নাম হচ্ছে—জল, বায়ু আর স্থানের প্রভাব; মড়ক; দীর্ঘকালস্থায়ী ব্যাধির স্বরূপ; আঘাত ও তাহার চিকিৎসা; মস্তকের আঘাত ইত্যাদি।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৬০ সালে কস্ দ্বীপে হিপোক্রেটিস্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

কিন্তু আজ দুহাজার বছর পরেও জগতে হিপোক্রেটিসের নাম যে অক্ষয় হয়ে বেঁচে আছে, তার সব চেয়ে বড় কারণ হচ্ছে যে, তিনিই প্রথম চিকিৎসকের প্রকৃত আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে যান এবং আজও জগতের সমস্ত চিকিৎসক সেই আদর্শ অনুসরণ করে চলেছেন। ডাক্তারী আরম্ভ করবার আগে হিপোক্রেটিস্ একটী শপথ গ্রহণ করেন—সেই শপথের মধ্যে প্রকৃত চিকিৎসকের আদর্শ পরিষ্কারভাবে লেখা আছে। আজও জগতের বিভিন্ন দেশে ডাক্তারী উপাধি নেবার সময় ভবিষ্যৎ চিকিৎসকগণকে সেই ঐতিহাসিক শপথ গ্রহণ করতে হয়। সেই শপথে হিপোক্রেটিস্ বলেছেন,—

"আপোলো আর অন্য সব দেব-দেবীর নামে আমি শপথ

করছি যে আমি আমার শিক্ষা ও বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী এই যে শপথ গ্রহণ করছি—তা পালন করবো। * * *

রোগীর কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে আমি আমার শক্তি ও শিক্ষা অনুযায়ী চিকিৎসা করবো—যাতে রোগীর ক্ষতি বা কোন অকল্যাণ হয়, জ্ঞানত সে-রকম কোনও ব্যবস্থা করবো না—কোনও মারাত্মক ওষুধ কাউকে দেবো না বা দিতেও পরামর্শ দেবো না। * * *

একান্ত পবিত্রভাবে ও নিষ্ঠার সঙ্গে আমি আমার এই চিকিৎসকের জীবন যাপন করবো। আমি যে বিষয়ে অনভিজ্ঞ, সে বিষয়ে চিকিৎসা করবো না। চিকিৎসার জন্যে যে বাড়ীতে আমি যাবো, সেখানে আমার একমাত্র লক্ষ্য হবে রোগীর কল্যাণ—তা ছাড়া সেই বাড়ী সম্পর্কে আমার আর কোনও যোগ থাকবে না। * * *

আমার ব্যবসায়ের সূত্রে আমি লোক সম্বন্ধে যে-সব কথা জানতে পারবো, সে-সব কথা জগতের আর কাউকেও জানাবো না। * * *

যতদিন আমি এই শপথ অনুযায়ী চলতে পারবো ততদিন আমি যেন সুখে ও শান্তিতে এই মহৎ ব্যবসায় চালাতে পারি। আর যদি এই শপথ ভাঙ্গি, তাহলে আমার ভাগ্যও যেন বিরূপ হয়।”

এই মহৎ শপথের সঙ্গে হিপোক্রেটিসের নাম আজও জগতে অক্ষয় হয়ে আছে।

আলেকজান্দ্রিয়ায় বিজ্ঞান-চর্চ্চা

তোমরা গ্রীক-বীর আলেকজান্দারের নাম নিশ্চয়ই জানো। জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর-পুরুষ বলেই সাধারণ লোকে তাঁকে জানে কিন্তু তিনি শুধু বীরপুরুষ ছিলেন না—জগতের সভ্যতাকে গড়ে তুলতে সেই প্রাচীনকালে তিনি সব চেয়ে বেশী সাহায্য করেছিলেন। জীবনে তিনি বহু যুদ্ধ করেছেন এবং সেই সব যুদ্ধে বহু দেশের বহু লোক নিহতও হয়েছে। যদি আলেকজান্দার শুধু নিজের দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা মেটাবার জন্যে এই সব যুদ্ধ করতেন—তাহলে তাঁর নাম ইতিহাসে এত বড় করে লিখে রাখবার কোনও দরকার ছিল না। তিনি যে-দেশ দিয়ে গেছেন, সেই দেশেই নতুন সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন—সেখানকার শাসন-ব্যবস্থা, শিক্ষা-দীক্ষা যাতে আরও উন্নত হয় তার জন্যে প্রভূত চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর এই চেষ্টার ফলে গ্রীক-সভ্যতা সেই সময় বলতে গেলে সারা জগতে ছড়িয়ে পড়ে।

আলেকজান্দার যখন মিশর জয় করেন, তখন তাঁর বাসনা হলো যে সেখানে তিনি একটা এমন নতুন নগর প্রতিষ্ঠা করে যাবেন যে সে-নগর হবে জগতের শিক্ষা-দীক্ষার সব চেয়ে বড় কেন্দ্র। নিজে সারা দেশ ঘুরে একটা জায়গা স্থির করে গ্রীস থেকে বিখ্যাত এঞ্জিনীয়ার আর ভাস্কর ডিনোক্রেটিস্‌কে ডেকে পাঠালেন। ডিনোক্রেটিস্‌কে তিনি তাঁর অন্তরের বাসনা জানিয়ে বল্লেন, "এইখানে একটা নতুন নগর গড়ে তুলতে হবে—সকল দিক দিয়ে তা হবে জগতে অদ্বিতীয়—আর আমার নামে সেই নগরের নাম হবে আলেকজান্দ্রিয়া।"

দেখতে দেখতে হাজার হাজার ক্রীতদাস কাজে লেগে গেল—কোটী কোটী টাকা ব্যয় করে নতুন নগরী আলেকজান্দ্রিয়া গড়ে উঠলো। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আলেকজান্দ্রিয়া হয়ে উঠলো সেই সময়কার সব চেয়ে বড় বাণিজ্যের কেন্দ্র। নানা দেশ থেকে লোক এসে সেখানে বসবাস করতে আরম্ভ করলো। গ্রীস থেকে বড় বড় জ্ঞানী গুণীরাও এই নগরে এসে বসবাস স্থাপন করলেন। দেখতে দেখতে ব্যবসায় বাণিজ্যে জ্ঞানচর্চ্চায় ঐশ্বর্য্যে আলেকজান্দ্রিয়া হয়ে উঠলো সেই সময়কার সব চেয়ে বড় নগরী। এইভাবে গ্রীস থেকে সভ্যতার ধারা এলো আলেকজান্দ্রিয়ায়।

খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩২৩ সালে বীরবর আলেকজান্দার দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়। মিশর সাম্রাজ্যের অধিপতি যিনি হলেন তাঁর নাম টলেমী। এই টলেমীদের আমলে আলেকজান্দ্রিয়া জ্ঞান-গরিমায় জগতে অদ্বিতীয় হয়।

তৃতীয় টলেমী একটা বিরাট অট্টালিকা তৈরী করে, তার নাম দিলেন Museum অর্থাৎ যেখানে muses জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরা থাকেন। আমাদের যেমন জ্ঞান-দেবী হচ্ছেন সরস্বতী—তেমনি প্রাচীন গ্রীকদের ছিল ন'জন জ্ঞান-দেবী—তাদের muses বলা হতো।

এই মিউজিয়ামের সঙ্গে একটা লাইব্রেরী, একটা থাকবার ও খাবার জায়গা, এবং অধ্যাপকদের বক্তৃতা দেবার জন্যে একটা

হলও তৈরী হল। এই লাইব্রেরীই জগতে আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরী বলে বিখ্যাত।

সে-সময় মুদ্রাযন্ত্র তো সৃষ্ট হয় নি—বই সব হাতে লেখা হতো; এবং এক একখানা বই আজকালকার মত হাজারে হাজারে ছাপাও হতো না। যার যে বই পড়বার প্রয়োজন হতো, সেই একখানি হাতে লেখা বই যেখানে আছে, তাকে সেইখানে গিয়ে তা পড়ে আসতে হতো। কেউ কেউ তা থেকে আবার নকল করে নিয়ে যেতো। আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরীতে বিভিন্ন বিষয়ের এমনি সাত লক্ষ বইএর পাণ্ডুলিপি ছিল। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিষয়ের বই সংগ্রহের দিকে টলেমীদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সেই সময় আলেকজান্দ্রিয়া সহরে একটা আইন ছিল যে, কোনও বিদেশী যদি কোনও নতুন বই সঙ্গে করে নিয়ে আসতো, তাহলে তাকে সেই বইএর একখানি নকল করে লাইব্রেরীতে দিয়ে যেতে হতো। লাইব্রেরীতে মাইনে করা সব লোক থাকতো তারা বই নকল করতো। এক যায়গায় এত বই পাওয়া যেতো বলেই বিভিন্ন দেশের জ্ঞানী লোকেরা তাই সেইখানে এসেই অধ্যয়ন করতেন।

এমনিতর ভাবে প্রায় সাত শো বছর ধরে এই নগরী ছিল বিজ্ঞান-সাধনার সব চেয়ে বড় কেন্দ্র। এই আলেকজান্দ্রিয়াতে শিক্ষা পেয়ে যে-সমস্ত লোক সভ্যতার ইতিহাসে অক্ষয় নাম রেখে গেছেন—তাঁদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন আর্কিমিডিস্।

পদার্থ-বিজ্ঞানের জন্মদিন

ইতালীর দক্ষিণে সিসিলী বলে যে দ্বীপ আছে—সেই দ্বীপের সেই সময়কার প্রধান নগরী সিরাকিউসে খৃষ্টপূর্ব্ব ২৮৭ সালে আর্কিমিডিস্ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজে ধনী ছিলেন, রাজপরিবারেও তাঁর যথেষ্ট সম্মান ছিল, কিন্তু যশ, প্রতিপত্তি বা অর্থের সমস্ত মোহ পরিত্যাগ করে, তিনি বিজ্ঞানের সাধনায়, মানুষের জ্ঞান-সম্পদ্ বাড়ানোর সাধনায় মৃত্যুর শেষ লগ্ন পর্য্যন্ত ব্যাপৃত থাকেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি যে শুধু অনেক নতুন তত্ত্ব দিয়ে গেছেন তা নয়, সেই সব তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে তিনি অনেক যন্ত্রও তৈরী করে গিয়েছেন। তোমরা বোধহয় জানো যে আজকাল আমেরিকানরা কলকব্জা তৈরী করতে ওস্তাদ। ওদের দেশে বাসন-মাজাও কলে হয়। এই আমেরিকানদের চলিত ভাষায় Yankee ইয়াঙ্কি বলে। একজন বিখ্যাত জার্ম্মাণ ঐতিহাসিক আর্কিমিডিস্ সম্বন্ধে বলেছেন, "The technical Yankee of antiquity"—"প্রাচীন যুগের কলকব্জা-তৈরী-করা ইয়াঙ্কি।" এই প্রাচীন কালের ইয়াঙ্কির জীবনের যে সব ঘটনা আমাদের জানা আছে তাই তোমাদের প্রথমে বলি।

বহুদিনের চেষ্টার পর হিরো বলে একজন লোক সিরাকিউসের রাজা হয়ে সিংহাসনে বসলেন। নিজের উদ্দেশ্য সফল

হওয়ায়, হিরোর বাসনা হলো যে, সেখানকার মন্দিরের প্রধান দেবীর মাথার জন্যে তিনি একটা সোণার মুকুট তৈরী করাবেন, দেবীকে উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করবার জন্যে।

স্বর্ণকারকে ডাকিয়ে তাকে একতাল সোণা ওজন করে দেওয়া হলো.। কিছুকাল পরে স্বর্ণকার দেবীর উপহারের জন্যে সুন্দর কারুকার্য্য-করা মুকুট তৈরী করে আনলো।

এধারে রাজার কাছে কি রকম করে খবর এলো যে স্বর্ণকার সোণা চুরি করেছে। কিন্তু ওজন করে দেখা গেল যে সোণার তালের ওজন যা ছিল, মুকুটারও ওজন ঠিক তাই-ই আছে। এখন কি করে বোঝা যায় যে, স্বর্ণকার সোণা চুরি করেছে কিনা, আর কতখানিই বা চুরি করেছে! দেবীর সোণা স্বর্ণকারে চুরি করবে রাজা হিরো তা সহ্য করতে পারলেন না। অথচ মুকুটটার গড়ন ও হয়েছিল চমৎকার। তাকে ভেঙ্গে গলিয়ে ফেলতেও ইচ্ছে হলো না। রাজা হিরো পড়লেন মহা-সমস্যায়।

এই সমস্যায় পড়ে রাজা আর্কিমিডিস্‌কে ডেকে পাঠালেন। আর্কিমিডিসের তখন খুব খ্যাতি। তাঁর চেয়ে বড় পণ্ডিত সিরাকিউসে আর ছিলনা। রাজার অনুরোধে তিনি এই সমস্যা-সমাধানের ভার নিলেন।

ভার তো নিলেন কিন্তু মুকুটটা না গলিয়ে কি করে তিনি ধরবেন যে স্বর্ণকার সোণা চুরি করেছে কিনা—রাত দিন তাই ভাবেন। এই চিন্তায় তিনি একেবারে তন্ময় হয়ে গেলেন।

একদিন স্নানের জন্যে স্নান-ঘরে ঢুকে জল-ভরা টাবে নামতেই, হঠাৎ সেদিন তাঁর লক্ষ্যে পড়লো যে কতকটা জল টাব থেকে পড়ে গেল। বিদ্যুৎ ঝলকের মত তাঁর মনে একটা সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সেইক্ষণেই এই ব্যাপার থেকে তিনি একটা নতুন তথ্যের সন্ধান পেলেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস হলো যে সেই তথ্যের সাহায্যে তিনি মুকুটের সমস্যা সমাধান করতে পারবেন। আপনার মনে সেই কথা ভাবতে ভাবতে তিনি ভুলে গেলেন যে তিনি উলঙ্গ অবস্থায় স্নান-ঘরে আছেন। আনন্দে অধীর হয়ে সেই উলঙ্গ অবস্থায়, **Eureaka, Eureaka,** পেয়েছি, পেয়েছি বলতে বলতে একেবারে সোজা রাজার নিকট গিয়ে উপস্থিত।

সেখানে সমস্ত লোকের সামনে আর্কিমিডিস্ তাঁর নতুন তথ্যের কথা জানিয়ে বল্লেন, "আমি স্নান করতে গিয়ে যেই টাবে নামলাম অমনি টাব থেকে খানিকটা জল পড়ে গেল। জলে আমার দেহের পরিমাপ যা, ঠিক সেই একই পরিমাপের জল টাব থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। সুতরাং যে-জলটা পড়ে গেল তার পরিমাপ ঠিক করলেই আমার দেহের পরিমাপ পাওয়া যাবে। এইভাবে মুকুট না গলিয়েই আমি তার পরিমাপ বার করে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, স্বর্ণকার মুকুট থেকে সোনা চুরি করেছে কি না।"

একটা বড় পাত্রে কাণাকাণি জল ভরা হলো। তারপর একটা সূতোয় বেঁধে আস্তে আস্তে মুকুটটী জলে ডুবিয়ে দেওয়া হলো।

এর ফলে স্বভাবতই খানিকটা জল সেই পাত্র থেকে পড়ে-গেল। তারপর একটা মাপ-ঠিক-করা পাত্র থেকে আগেকার পাত্রে জল ঢেলে দেখা হলো কতখানি জল পড়ে গিয়েছে তারপর আর্কিমিডিস্ মুকুটের সমান ওজনের দুটো তাল তৈরী করলেন—একটা সোণার আর একটা রূপোর। এখন একই ওজনের তিনটে জিনিস হলো, সোণার তাল, রূপোর তাল, আর স্বর্ণকারের তৈরী সেই মুকুট।

প্রথমে সোণার তালটী জলে ডুবিয়ে কতটা জল পড়ে গেল দেখা হলো। তারপর রূপোর তালটী জলে ডোবান হলো দেখা গেলো যে সোণার তাল ডোবানর ফলে যতটা জল পড়ে গিয়েছিল, রূপোর তালটা ডোবাতে তার দ্বিগুণ জল বেরিয়ে গেল। তারপর সোণার মুকুটটী ডোবান হলো। দেখা গেল যে সোণার তালটী ডোবানর ফলে যতটা জল পড়ে গিয়েছিল, তার চেয়ে বেশী জল এবার পড়ে গেল কিন্তু রূপোর তালটা ডোবানর ফলে যতটা জল পড়ে গিয়েছিল, তার ঢের কম। সুতরাং নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণ হয়ে গেল যে মুকটটায় কিছু রূপো মেশান আছে।

তারপর আর্কিমিডিস্ সোণায় আর রূপোয় মিশিয়ে আরও কতকগুলি বিভিন্ন ওজনের তাল তৈরী করে, সে গুলিকেও আগেকার মত জলে ডুবিয়ে ডুবিয়ে বলে দিলেন—স্বর্ণকার দেবীর স্বর্ণমুকুটে কতখানি রূপো মিশিয়েছে বা কতখানি সোণা চুরি করেছে।

রাজা স্বর্ণকারকে ডাকিয়ে পাঠালেন। ধরা পড়ে সেও নিজের অপরাধ স্বীকার করলো।

জিনিষের পরিমাপ আর ওজন সম্বন্ধে আর্কিমিডিস্ আরও অনেক গবেষণা করেন। এই সব গবেষণার ফলে, তিনি বিজ্ঞানের একটা মূল সত্য প্রতিষ্ঠা করেন, যে ওজনের জল পড়ে যায়, প্রত্যেক জিনিসেরই জলে ঠিক ততখানি ওজন কমে যায়।

এই ঘটনা সম্বন্ধে একজন বড় বৈজ্ঞানিক বলেন যে, যেদিন আর্কিমিডিস্ উলঙ্গ অবস্থায় রাস্তা দিয়ে Eureaka, Eureaka বলতে বলতে ছুটেছিলেন, সেদিন হলো অঙ্কশাস্ত্রসম্মত পদার্থ-বিজ্ঞানের (Physics) জন্মদিন, আর যেদিন নিউটন বাগানে বসে আপেল ফল পড়তে দেখে নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ফল মাটীতে পড়ে কেন, সেদিন পদার্থ-বিজ্ঞান যৌবনে এসে পড়লো।

আগেই বলেছি যে আর্কিমিডিস সে-যুগের ছিলেন সব চেয়ে বড় যন্ত্র-নির্ম্মাতা। প্রায়ই সমুদ্রের ধারে বন্দরে গিয়ে দেখতেন যে কুলী মজুররা কি কষ্ট করে জাহাজ থেকে ভারি ভারি জিনিষ ওঠান-নামান করছে। লম্বা বাঁশের লাঠী পাথরের ওপর রেখে চাপ দিয়ে তাঁরা পাথর ঠেলে তুলতো। কতখানি দূর থেকে, লাঠী কতখানি ছোট বা বড় করে চাপ দিলে বেশী জোর পাওয়া যায়, সে সব তারা কিছুই জানতো না। এই বিষয়ে গবেষণা করে তিনি দেখিয়ে দিলেন যে কিভাবে লাঠীটী

রাখলে, যে-জিনিস ঠেলে তুলতে হবে তার থেকেই বা কতদূরে ঠেস-দেওয়া পাথরটী রাখলে এবং লাঠীর মাপ সেই অনুপাতে কতখানি বড় করলে, এখন যে-জিনিষ ঠেলতে পাঁচজন লোকের প্রয়োজন হয়, সে-যায়গায় একজন লোক চাপ দিলেই অনায়াসেই সেই কাজ করতে পারবে।

এইভাবে দণ্ড-যন্ত্র যাকে ইংরাজীতে বলে lever, তার গঠন আর অবস্থিতির নিয়ম বার করে আর্কিমিডিস্ রাজাকে বলেছিলেন, আমাকে যদি একটা দাঁড়াবার যায়গা দিতে পারেন, তা হলে আমি লাঠী দিয়ে এই পৃথিবীটাকে ঠেলে দিতে পারি।

রাজা হিরো আর্কিমিডিসের কথা শুনে বিস্মিত হয়ে বললেন, অত দুঃসাধ্য কাজ আপনাকে করতে আমি বলি না। আপনি যদি একটা কল বার করতে পারেন—যার সাহায্যে কারখানা থেকে আমার জাহাজগুলো টেনে অনায়াসে সাগরে ফেলা যেতে পারে—তা হলে বড় সুবিধে হয়। দেখেছেন তো, কত লোক লাগে, একটা জাহাজকে টেনে জলে ভাসাতে আর কি হাঙ্গামাই না পেতে হয়!

"আচ্ছা, তাই হবে" বলে আর্কিমিডিস্ নতুন যন্ত্রের কথা ভাবতে লাগলেন এবং কিছুদিন পরে একটা যন্ত্র তৈরী করলেন। এই যন্ত্রটীর নাম হলো Endless Screw—সেই হলো জগতের প্রথম বিজ্ঞান-সম্মত কপিকল এবং সেই পদ্ধতি আমরা আজও অনুসরণ করে চলছি। খাঁজ কাটা একটা

লোহার চাকতির সঙ্গে একটা স্ক্রু্র প্যাঁচ-দেওয়া লোহার দণ্ড লাগান থাকতো। এমনিভাবে এই দুটী জিনিষ তৈরী যে, দড়ি দিয়ে টানলেই স্ক্রুর প্যাঁচগুলো লোহার চাকতির ধারে ভাঁজে ভাঁজে গিয়ে পড়তো—আর এক একটা ভাঁজ পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে চাকতিটা ঘুরতে আরম্ভ করতো—আর সেই চাকতি-ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে জিনিষে চাপ পড়তো। যন্ত্রটী এমনি তৈরী যে অবিরাম স্ক্রুর প্যাঁচগুলি চাকতির ভাঁজের মধ্যে দিয়ে ঘুরে ঘুরে আসবে—সেইজন্যে এই যন্ত্রটাকে Endless Screw বলা হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে আর্কিমিডিস্ মাত্র একটা দড়ি ধরে টেনে দেখিয়ে দিলেন কি রকম অনায়াসে কারখানা থেকে জাহাজ টেনে জলে ভাসানো যেতে পারে।

যখন আর্কিমিডের যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তখন তাঁর স্বদেশে এক মহা-বিপত্তি ঘটলো। রোমানরা এসে সিরাকিউস্ রাজ্য আক্রমণ করলো। রোমানদের সঙ্গে সিরাকিউসবাসীদের এক তুমুল সংগ্রাম বেঁধে গেল।

রোমনদের সৈন্য-সামন্ত ছিল অনেক এবং তাদের মধ্যে তখন খুব বড় বড় যোদ্ধাও ছিল। সিরাকিউসের রাজা বিপন্ন হয়ে আবার আর্কিমিডিসের শরণাপন্ন হলেন। স্বদেশের সম্মান রক্ষা করবার জন্যে আর্কিমিডিস্ বড় বড় পাথর-ছোঁড়া এক রকম যন্ত্র তৈরী করলেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে পাথর-ছুঁড়ে সিরাকিউসের সৈন্যরা রোমানদের নৌকো ডুবিয়ে দিতে

লাগলো, চারদিক থেকে অসংখ্য পাথর এসে তাদের সৈন্য-শ্রেণীকেও ছত্রভঙ্গ করে দিতে লাগলো।

রোমানদের প্রধান সেনাপতি মার্সেলাস্ বহু কষ্টে সৈন্য নিয়ে সিরাকিউস্ শহরে প্রবেশ করলেন। শহরে প্রবেশ করেই তিনি সৈন্যদের বলে দিলেন, কেউ যেন আর্কিমিডিস্‌কে কোনও রকম আঘাত না করে। আর্কিমিডিসের প্রতিভার কথা মার্সেলাস্ ভাল রকমই জানতেন।

শহরে যখন শত্রুপক্ষের সৈন্যরা প্রবেশ করেছে, আপনার চিন্তায় আপন-ভোলা বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস্ তখন সমুদ্রের ধারে একটা ছড়ি নিয়ে বালিতে দাগ কেটে জ্যামিতির একটা নতুন তত্ত্ব ভাবছিলেন।

একদল সৈন্য এসে দেখে একটা বুড়ো, বালিতে বসে কি দাগ কাটছে। সৈন্যদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলো, তোমার নাম কি আর্কিমিডিস্ ?

কোনও উত্তর নেই। আবার তারা জিজ্ঞাসা করলো, তোমার নাম কি আর্কিমিডিস্ ?

আর্কিমিডিস্ তখন চিন্তায় মগ্ন—একটা নতুন তত্ত্বের সন্ধান তখন তাঁর মনকে পেয়ে বসেছে। তিনি বিরক্ত হয়ে বল্লেন, একটু দাঁড়াও, এখন বিরক্ত করো না।

উত্তেজিত সৈন্যরা দাঁড়ালো না—তারা আর্কিমিডিস্‌কে—জগতের প্রথম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিককে একান্ত নির্ম্মম ভাবে হত্যা করে চলে গেল।

মার্সিলাস্ যখন এই খবর শুনলেন তখন বেদনায় তাঁর মন ভরে গেল।

আর্কিমিডিস্ একবার বলেছিলেন যে, যখন তাঁকে সমাহিত করা হবে, তখন তাঁর কবরের ওপর যেন তাঁর উদ্ভাবিত জ্যামিতির একটা সমস্যার রেখা-চিত্র এঁকে দেওয়া হয়।

মার্সিলাস বৈজ্ঞানিকের শেষ-অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন।

জ্যামিতি, বীজগণিত এবং যন্ত্র-বিজ্ঞানের ইতিহাসের সঙ্গে আর্কিমিডিসের নাম চিরকাল সংযুক্ত থাকবে। বর্ত্তমান যন্ত্র-বিজ্ঞানের তিনিই জনক। জ্যামিতির যে-অংশের সাহায্যে বিভিন্ন বৃত্তাকার পদার্থের আয়তন স্থির হয়—তা আর্কিমিডিস্ রচনা করে যান। বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্বের প্রাথমিক নিয়মও তিনি আমাদের দিয়ে গিয়েছেন। প্রাচীন য়ুরোপে বীজগণিতে infinitesimal calcules এর সূচনা তিনিই করেন।

আর্কিমিডিসের প্রতিভার বিশেষত্ব হচ্ছে যে তিনি যেমন বৈজ্ঞানিক নিয়ম বা তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন—তেমনি সেই সব তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে যন্ত্র তৈরী করেও গেছেন।

ইউক্লিড

আলেকজান্দ্রিয়ার পণ্ডিতদের মধ্যে ইউক্লিডের সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ ভাবে আজও পরিচিত। ইউক্লিড সর্ব্বসমেত জ্যামিতির তেরোখানি বই লেখেন—তার মধ্যে প্রথম ছয়খানি আজও পর্য্যন্ত চলিত। ইউক্লিডের নাম জানে না—জগতে এমন কোনও স্কুলের ছাত্র নেই। জ্যামিতির সমস্যা সমাধান করবার সময় ধাপের পর ধাপ আমরা যে ভাবে আজকাল বিচার করে শেষে সিদ্ধান্ত করি, সে-প্রথা প্রথম ইউক্লিড পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ করেন। অনেক ছাত্র আছেন, যিনি হয়ত জ্যামিতির নামেই ভয় পান, তাঁর আশ্বাসের জন্যে ইউক্লিডের জীবনী থেকে একটা গল্প বলি। তোমরা শুনে হয়ত আশ্বস্ত হবে যে জ্যামিতির প্রতি এই আতঙ্ক মানুষের অতি পুরাতন ব্যাধি। মিশরের রাজা টলেমীর শিক্ষক ছিলেন ইউক্লিড। জ্যামিতি সম্বন্ধে রাজা টলেমীরও আতঙ্ক ছিল। একদিন তিনি ইউক্লিডকে জিজ্ঞাসা করেন—অন্য কোনও উপায়ে জ্যামিতি শেখা যায় না? ইউক্লিড উত্তর দিয়েছিলেন, There is no royal road to Geometry জ্যামিতি শেখবার জন্যে আলাদা কোন রাজকীয় ব্যবস্থা নেই! এই ব্যাপার সম্বন্ধে আজকালকার একজন বৈজ্ঞানিক এক যায়গায় লিখেছেন যে, তাঁকে যদি রাজা টলেমী এই প্রশ্ন করতো তাহলে তিনি উত্তর দিতেন—ব্যবস্থা আছে বটে, তবে সে রাজার জন্যে নয়, যার প্রতিভা আছে তার জন্যে! ইউক্লিডের জীবন সম্বন্ধে শুধু এইটুকু জানা যায় যে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে জ্ঞান অর্জ্জন করেন।

পিথাগোরাস থেকে এরিস্টটল

জগতের যে সব কাজ আমাদের অধিকারের বাইরে স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে, তাদের আমরা বলি, প্রাকৃতিক ঘটনা —যেমন ধর, দিন আর রাত্রি। আমাদের একবারও পরামর্শ না করে সকাল বেলা সূর্য্য উঠছে—দিনের আলোয় পৃথিবী ভরে যাচ্ছে—আবার আমাদের কোনও অনুমতি না নিয়ে কখন সূর্য্য ডুবে যাচ্ছে—সন্ধ্যার অন্ধকারে পৃথিবী ভরে আসছে। আবার চাঁদ এসে সেই অন্ধকারে আলো দিচ্ছে। এমনি করে দিনের পর রাত, রাতের পর দিন, চাঁদ আর সূর্য্য উঠছে আর অস্ত যাচ্ছে—এদের এই ওঠা আর অস্ত-যাওয়াকে আমরা কোন মতেই বাধা দিতে পারি না। তাদের আপনাদের নিয়মে তারা আসে যায়, পৃথিবীতে কখনও হয় আলো, কখনও হয় অন্ধকার।

কত হাজার বছর ধরে এমনিতর সূর্য্য উঠেছে আর অস্ত গিয়েছে—কারুর মনে কোনও দিন প্রশ্ন জাগে নি—কেন এমন হয়—কেন সে এলে আলোর জোয়ারে পৃথিবীর বুক ভরে যায়—কেন সে চলে গেলে—কালো হয়ে যায় পৃথিবীর আলো-করা মুখ? কেনই বা তার আলো এত উজ্জ্বল প্রখর— আর কেনই বা চাঁদের আলো এত কোমল মৃদু?

তারপর, কোন একদিন আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে, প্রতিদিনের এই আলো-ছায়ার খেলা দেখতে দেখতে, কবে কার অজ্ঞাতনামা কোন মানুষের মনে প্রশ্ন উঠেছিল, সত্যিই

তো—কেন এমন হয় ? কি নিয়মের বশে দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন হচ্ছে ? যেদিন মানুষের মনে প্রকৃতির এই রহস্য জানবার জন্যে একটা আকুলতা এলো—সেই দিনই হলো বিজ্ঞানের জন্ম—কেন না, প্রকৃতির সমস্ত রহস্য, সমস্ত নিয়ম জানাই হলো বিজ্ঞানের প্রথম কাজ।

সেদিনকার মানুষের কাছে প্রকৃতির এই রহস্যটাই প্রথমে চোখে পড়ে—চোখের সামনে এর চেয়ে বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন অন্য আর কিছুই ছিল না। সূর্য্য উঠলে তারা কাজ আরম্ভ করতো—সূর্য্যের দিকে চেয়ে, তারা সময় ঠিক করতো—তাই সূর্য্যের সম্বন্ধে তাদের প্রথম ঔৎসুক্য হওয়াই স্বাভাবিক।

তখন যন্ত্রপাতি কিছুই ছিল না। পরীক্ষা করবার জন্য এত বড় বড় ল্যাবরেটরীও ছিল না। তখন তারা চোখে যা দেখতো তাকেই সত্যি বলে মানতো। সূর্য্য ওঠে আবার অস্ত যায় দেখে, তাদের ধারণা হলো, সূর্য্যটা ঘুরছে। আর পৃথিবী তো স্থির হয়েই আছে—কেন না, তারা সেটা প্রত্যক্ষ দেখতো—সবই তো স্থির ! তাই তারা সহজ ভাবে এ প্রশ্নের উত্তর ঠিক করলো যে, আমাদের পৃথিবী স্থির হয়ে আছে, আর সূর্য্য অনবরত পূর্ব্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে।

এইভাবে কিছুদিন চলবার পর, আর একদল লোকের মনে এই প্রশ্নের আর একটা উত্তর এলো—এও তো হতে পারে যে পৃথিবী নিজেই পশ্চিম থেকে পূর্ব্বদিকে আবর্ত্তিত হয়ে চলেছে আর সেই আবর্ত্তনের সময় সূর্য্য ঠিক একযায়গাতেই অবস্থিত আছে।

সূর্য্য আর অন্যান্য গ্রহের সঙ্গে আমাদের পৃথিবীর কি সম্বন্ধ সে বিষয়ে যিনি প্রথম একটা বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেন, তাঁর নাম হলো পিথাগোরাস্। তিনি ঠিক কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা স্থির করে বলা যায় না এবং তাঁর জীবন সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা নাই।

শুধু এইটুকু জানা যায় যে, তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে একটা গোপন-সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যা শিক্ষা দিতেন, তা গোপনে এই সমিতিতেই দেওয়া হতো—সেজন্যে তাঁর সম্বন্ধে জগৎ বিশেষ কিছুই জানে না। পাটীগণিত সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং জ্যামিতিতেও তিনি কয়েকটী নতুন সমস্যা সংযোজিত করেন।

পিথাগোরাস্ এসে বল্লেন যে, সূর্য্য অন্তরীক্ষে থেকে পৃথিবীর চারিদিক পরিভ্রমণ করছে না—সূর্য্য এক যায়গাতেই স্থির হয়ে আছে। পৃথিবী, বুধ, শুক্র প্রভৃতি গ্রহ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে পিথাগোরাসের ধারণা ছিল যে—এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র-স্থলে একটা বিরাট অগ্নিকুণ্ড আছে। সেই অগ্নিকুণ্ডের চারদিকে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, বুধ, মঙ্গল, প্রভৃতি গ্রহরা অবস্থিত। সূর্য্য হলো সেই অগ্নি-কুণ্ডের প্রতিবিম্ব। আর সেই অগ্নিকুণ্ডের চারিধারে এই সমস্ত গ্রহের অধিষ্ঠাতা দেবতারা স্বর্গীয় বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করছেন।

পিথাগোরাসের পর এলেন প্লেটো। তিনি হলেন প্রাচীন গ্রীসের একজন খুব বড় পণ্ডিত। তাঁর গুরুর নাম তোমরা বোধহয় অনেকে জানো। তাঁর গুরুর নাম হলো সক্রেটীস্। সক্রেটীস্ সেই সময়কার যুবকদের যে-শিক্ষা দিতেন, তা সরকারী লোকদের মনঃপূত হলো না। তাঁরা সক্রেটীসের বিচার করলেন এবং বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা হলো। সক্রেটীস্ প্রিয় শিষ্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সত্যের জন্যে বিষপান করলেন।

সক্রেটীসের সব চেয়ে প্রিয় শিষ্য ছিলেন, প্লেটো। গুরুর মৃত্যুর পর তিনি গ্রীস ত্যাগ করে নানাদেশ ভ্রমণ করেন এবং নানা জ্ঞান অর্জ্জন করে আবার গ্রীসে ফিরে একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। এই স্কুলটী ইতিহাসে Platoর Academy বলে বিখ্যাত। এখান থেকে অনেক বিদ্বান্ আর পণ্ডিত লোক একদিন বেরিয়েছিল।

প্লেটোর এই বিখ্যাত Academyর দরজায় লেখা ছিল, Let none enter here, who is not acquainted with geometry—যে ব্যক্তি জ্যামিতি জানে না, সে যেন আমার এই স্কুলের দরজা না মাড়ায়। এই থেকে বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় যে সে-সময় লোকে জ্যামিতিকে কতখানি বড় যায়গা দিয়েছিল। প্লেটোর মতে গ্রহরা—কেউ দেবতা নয়—পৃথিবী বা সূর্য্য কেউ দেবতা নয়। সূর্য্য সমান ও অপরিবর্ত্তিত বেগে বৃত্তাকার পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে! কিন্তু কেন যে সূর্য্য তা করে তা তিনি নিরূপণ করতে পারেন নি।

এই সম্বন্ধে তাঁর যা ধারণা তা তাঁর লেখা একটা গল্প থেকে জানা যায়। প্লেটো লিখছেন, এল্‌সাইনাস বলে একজন লোক যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আহত হয়ে পড়ে যায়। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে, তাকে মৃত মনে করে যখন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন সবাই বিস্মিত হয়ে দেখে যে লোকটী উঠে বসলো। ব্যাপার কি? উঠে সে সবাইকে ডেকে বল্লে যে, সে আহত হয়ে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অচৈতন্য হয়ে থাকবার সময় এক দেব দূত এসে তাকে স্বর্গে নিয়ে যায়। স্বর্গে গিয়ে দেখে যে বিধাতাপুরুষ দুই হাঁটুর মধ্যে একটা দণ্ড নিয়ে বসে আছেন; ঐ দণ্ডের জায়গায় জায়গায় কতকগুলো চেপ্টা আংটী বাঁধা আছে। সমস্ত জ্যোতিষ্ক সেই আংটীতে আটকান রয়েছে। তোমরা সহজেই অনুমান করতে পারো যে এ কবি-কল্পনা।

তারপর এলেন গ্রীক পণ্ডিত টলেমী। তিনি এসে তাঁর আগেকার পণ্ডিতদের চেয়ে অনেক বেশী গবেষণা করে বল্লেন যে, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত আকাশের উত্তর আর দক্ষিণ দিক লক্ষ্য করে ঠিক একই ভাবে অবস্থিত। তা থেকে তিনি স্থির করেন যে পৃথিবী যদি সচলা হতো তা হলে মেরুপ্রদেশও চিরকাল অচল থাকতো না। যে নক্ষত্রটী আজ আমাদের মাথার ওপরে উঠলো, পৃথিবী যদি সচলা হতো, তা হলে কয়েক বছর পরে দেখা যেতো যে নক্ষত্রটী অন্য দিকে সরে গিয়েছে। তা যখন দেখা যায় না—তখন পৃথিবী সচলা নয়—পৃথিবী অচলা।

পৃথিবী যে অচলা তার আর একটা মজার প্রমাণ টলেমী দেন। টলেমী বলেন যে, আকাশের মেঘ, উড়ন্ত পাখী, কিম্বা যে ঢিল উঁচুতে ছোঁড়া হয়েছে, সেগুলো হলো পৃথিবীর বাইরের জিনিষ। সুতরাং পৃথিবী যদি চলতো, তা হলে, যে মেঘখানা আমরা চোখের সামনে দেখছি, তাকে পিছনে ফেলে যেতাম, পাখীও তার বাসায় ফিরতে পারতো না—কিম্বা উঁচু দিকে ছোঁড়া ঢিল ঠিক সেই যায়গাতেই আবার এসে পড়তো না। স্থিরা পৃথিবী হলো তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র। সেইজন্য টলেমীর এই সিদ্ধান্তকে পৃথ্বী-কেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত বলে।

টলেমীর এই পৃথ্বী-কেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত চৌদ্দ শ' বছর ধরে জগতের অধিকাংশ লোক সত্য বলে মেনে চলে। মাঝে মাঝে দুই একটী লোক সামান্য সামান্য আপত্তি করলেও মূল ব্যাপার সম্বন্ধে আপত্তি তোলবার লোক এই চৌদ্দশ' বছরের মধ্যে আর কেউ জন্মায় নি।

যীশুখৃষ্ট জন্মাবার প্রায় ২৭০ বৎসর আগে এরিস্টার্কাস্ বলে আলেকজান্দ্রিয়া শহরে এক গ্রীক পণ্ডিত ছিলেন। পৃথিবী থেকে চাঁদ ও সূর্য্য পরস্পর কি অনুপাতে দূরে অবস্থিত, তা স্থির করবার জন্যে তিনিই প্রথম একটা বৈজ্ঞানিক চেষ্টা করেন। সেই প্রাচীনকালে যখন দূরবীক্ষণ যন্ত্র বা বিশেষ কোনও যন্ত্রপাতি ছিল না, তখন এরিস্টার্কাস্ দিনের পর দিন চাঁদের ক্ষয় লক্ষ্য করে জ্যামিতির সাহায্যে স্থির করেন যে

চন্দ্র পৃথিবী থেকে যত দূরে, তার ১৯ কি ১৮ গুণ দূরে চন্দ্র সূর্য্য থেকে অবস্থিত। কিন্তু আসলে চন্দ্র তার শত গুণ বেশী দূরে অবস্থিত। জ্যোতির্মণ্ডল লক্ষ্য করে তিনি আর একটী সিদ্ধান্তে আসেন যে যদি ৭২০টী সূর্য্য পাশাপাশি রাখা যায়, তাহলে আকাশের পরিধি ভরে যাবে।

আলেকজান্দ্রিয়াতে আর একজন বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন, তাঁর নাম হলো—এরাটস্থিনিস্। জগতে তিনিই প্রথম পৃথিবীর পরিধি মাপবার একটা বৈজ্ঞানিক চেষ্টা করে অনেক-খানি সত্যের কাছাকাছি আসেন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থশালার লাইব্রেরীয়ান অথবা গ্রন্থগারিক ছিলেন। প্রায়ই তিনি নৌকো করে নীলনদের উৎসের দিকে যাতায়াত করতেন। এইভাবে নীল-নদের ওপর বিচরণ করতে করতে তিনি লক্ষ্য করলেন যে যতই তিনি অগ্রসর হন ততই দক্ষিণ-দিকে নতুন সব তারা দেখা যায়, আর সেই সঙ্গে উত্তর দিকের তারারা অদৃশ্য হয়ে আসে। সেই থেকে তাঁর ধারণা হলো যে পৃথিবী নিশ্চয়ই গোলাকার এবং তিনি যদি এইরকম ভাবে নৌকা বেয়ে যেতে পারতেন, তাহলে একদিন আবার এই আলেকজান্দ্রিয়াতেই ফিরে আসতে পারতেন।

পৃথিবী গোল এই সিদ্ধান্ত ঠিক করে, তিনি তার পরিধি মাপবার জন্যে জ্যামিতির সাহায্য নিলেন। তোমরা হয়ত

জানো যে একটা বৃত্তের পরিধি মাপতে হলে, সেই বৃত্তের একটা অংশের মাপ পেলে জ্যামিতির সাহায্যে বার করা যায় যে, সেই বৃত্তটার পরিধি কত।

এই স্থির করে তিনি আলেকজান্দ্রিয়া থেকে আসৃওয়ান বলে একটা যায়গা পর্য্যন্ত গেলেন—এই পথটুকুর মাপ নিয়ে দেখলেন যে ৫২০ মাইল। তারপর লক্ষ্য করে দেখলেন দুপুর বেলা আলেকজান্দ্রিয়াতে যেখানে সূর্য্য ছিল, আসওয়ানে তার ৭ ডিগ্রী ওপরে সূর্য্য রয়েছে। সেই থেকে জ্যামিতির সাহায্যে তিনি বার করলেন যে যে-পথটা তিনি বেয়ে এসেছেন অর্থাৎ ৫২০ মাইল, সেটা হলো সম্পূর্ণ বৃত্তটার ৫০ ভাগের এক ভাগ। সুতরাং পৃথিবীর পরিধি হলো ৫২০ × ৫০ = ২৬০০০ মাইল। পৃথিবীর আসল পরিধি হচ্ছে ২৩,৭০০ মাইল। যে-সময় কোনও যন্ত্রপাতি ছিল না,সে সময় সত্যের কাছাকাছি আসা কম কৃতিত্বের কথা নয়। আজকালকার মত তখন নিখুঁত কোন মানচিত্রও ছিল না। তিনি যদি জানতেন যে আসওয়ান আলেকজান্দ্রিয়ার ঠিক দক্ষিণে নয়, একটু দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে, তাহলে হয়ত তিনি নিখুঁত ভাবেই পৃথিবীর পরিধি বার করতে পারতেন।

আজ তোমরা একযায়গায় বসে যে ভাবে জগতের সমস্ত জ্ঞান আয়ত্ত করবার সুবিধে পাচ্ছ, প্রাচীনকালে তা মোটেই ছিল না। তার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলেই তোমরা প্রথমেই হয়ত বলবে, সেদিন সেই প্রাচীন যুগে মুদ্রাযন্ত্র ছিল

না এবং আজকালকার মত নানারকমের বৈজ্ঞানিক সুবিধে ছিল না। সে কথা সত্যি, কিন্তু সেই সঙ্গে তোমাদের আর একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, আমরা যে কোনও বিষয়ে একটা ধারাবদ্ধ ভাবে একসঙ্গে একযায়গায় সব পড়তে পাই—প্রাচীন যুগের ছাত্ররা তা পেতো না। সেটা যে কতদূর অসুবিধের কথা, তা আজ তোমরা ধারণাই করতে পারবে না। ধর তুমি জ্যামিতি শিখতে চাও। বইএর দোকান থেকে ইউক্লিডের বই কিনলেই তুমি একযায়গায় জ্যামিতির সমস্ত সমস্যা গুলিই পেলে কিন্তু এমন একদিন ছিল, যখন জ্যামিতির এই সব সমস্যা গুলি নিয়মমত এক যায়গায় একটার পর একটা সাজান ছিল না। কতকগুলো সমস্যার বিষয় হয়ত গ্রীসের পণ্ডিতরা জানতেন, কতকগুলো সমস্যা হয়ত মিশরের পণ্ডিতরা জানতেন; গ্রীসের মধ্যেও হয়ত সব পণ্ডিত তা জানতেন না—এমনি এলোমেলো ভাবে প্রাচীনকালে চারদিকে জ্ঞান ছড়িয়ে ছিল। কিন্তু এই রকম চারদিকে ছড়ানো এলোমেলো জ্ঞান নিয়ে বিজ্ঞান বাড়তে পারে না। যদি প্রতিমার হাতটা পড়ে থাকে একযায়গায়, তার মাথাটা পড়ে থাকে আর একযায়গায়, তা হলে আর তাকে প্রতিমা বলা যায় না; হাত-পা—সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেটী যেখানে থাকবার কথা ঠিক সেইখানে বসিয়ে একটা সমগ্র মূর্ত্তি যখন হয়, তখন আমরা বলি প্রতিমা।

হাত-পা-এলেমোলো-ভাবে-ছড়ানো প্রতিমার মত প্রাচীন

যুগে আমাদের জ্ঞান ছিল ছড়ানো। এক এক যুগে এমন এক একজন লোক এসেছেন, যিনি চারিদিককার-ছড়ানো এই সব বিভিন্ন তত্ত্বকে নিয়মিতভাবে একযায়গায় সাজিয়ে গুজিয়ে একটা সমগ্র প্রতিমার মত করে গড়ে তুলেছেন। তাঁরা তাই করেছিলেন বলেই আমাদের জ্ঞান-বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। যাঁরা প্রাচীন কালে এই রকম ভাবে মানুষের সমস্ত বিক্ষিপ্ত জ্ঞান-সাধনাকে একযায়গায় নিয়মিতভাবে সাজিয়ে জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কণ্ঠে প্রজ্ঞার অম্লান কুসুম-হার পরিয়ে দিয়ে গেছেন তাঁরা সত্যিই জগতের সকলের নমস্য। ইংরেজীতে সেই মহাপুরুষদের বলে **Systematizer of knowledge.**

প্রাচীন যুগে য়ুরোপে এরিষ্টটল বলে এক মহাজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর আগেকার সমস্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চিন্তাধারাকে এই রকমভাবে একত্র করেন এবং তাকে নিজের জ্ঞানদ্বারা সমৃদ্ধও করেন।

সেকেন্দর শাহ্‌র দিগ্বিজয়ের চেয়েও এরিষ্টটলের এই কাজ মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে ঢের দামী।

গ্রীসের অন্তর্ভুক্ত ষ্টাগিরা বলে একটী নগরে যীশুখৃষ্ট জন্মাবার ৩৮৪ বছর আগে এরিষ্টটল জন্মগ্রহণ করেন। এরিষ্টটলের পিতা সেকেন্দার শাহ্‌র পিতা ম্যাসিডোনের রাজা প্রথম ফিলিপের গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন। এরিষ্টটল নিজে সেকন্দর শাহ্‌র শিক্ষক ছিলেন।

এরিষ্টটল বিজ্ঞানকে দুভাগে ভাগ করেন, প্রথম শ্রেণীর

নাম দেন Theoretical science তত্ত্বমূলক বিজ্ঞান, যার সাহায্যে প্রকৃতির নিয়মকানুন সব জানা যায়। যেমন ধর অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান। দ্বিতীয়টা হলো Practical science অর্থাৎ যে জ্ঞানের দ্বারা কোনও একটা কিছু তৈরী করা যায় বা যার একটা সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য আছে যেমন ধর ডাক্তারী, এঞ্জিনীয়ারিং, শারীর-তত্ত্ব ইত্যাদি।

নৃ-তত্ত্ব অর্থাৎ Biology সম্বন্ধে এরিষ্টটল এসে প্রথম বল্লেন যে আমাদের এই জীবন-এর নিজের ক্ষয় ও বৃদ্ধির একটা স্বতন্ত্র শক্তি আছে। আমাদের দেহের মধ্যে এমন একটা শক্তি আছে যে সে নিজেই তার আহার্য্য সংগ্রহ করে নেয়।

Zoology অর্থাৎ পশুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি প্রধানত তিনটি শ্রেণীভাগ করেন। প্রথম ভাগের নাম হলো (1) Records of Animals—পশুদের জীবন-যাত্রা নিয়ে সাধারণভাবে এই অংশে আলোচনা করা হয়েছে; দ্বিতীয় ভাগের নাম হলো (2) On the Parts of Animals, এই বিভাগে পশুদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও তাদের ক্রিয়া কলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন; তৃতীয় ভাগ হলো (3) On the generations of animals কেমন করে পশুদের বংশ বৃদ্ধি হয় সেই সম্বন্ধে এই বিভাগে আলোচনা করেছেন। তিনি পাঁচশো বিভিন্ন পশুর নাম উল্লেখ করে তাদের নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং পশুর দেহচ্ছেদ করে তাদের দেহের গঠন সম্বন্ধে সাক্ষাৎ ভাবে জ্ঞান অর্জ্জন করেন। পশুতত্ত্ব সম্বন্ধে

বর্ত্তমান যুগে নতুন করে যে সব তত্ত্ব আমরা শিখেছি, তার অনেক কথাই সেদিন এরিষ্টটল আবিষ্কার করে যান।

দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, নৃ-তত্ত্ব, পশুতত্ত্ব প্রভৃতিতে এরিষ্টটলের যতখানি কৃতিত্ব ছিল, জ্যোতির্বিদ্যায় বা পদার্থবিদ্যায় তাঁর ততখানি কৃতিত্ব দেখা যায় না।

অন্যান্য গ্রীক পণ্ডিতদের মত এরিষ্টটলও বিশ্বাস করতেন যে চারটী মৌলিক উপাদানে, যাকে আমরা element বলি, মৃত্তিকা, জল, বায়ু আর অনল এই চারটী মৌলিক উপাদানে পৃথিবীর সমস্ত বস্তু গঠিত। এর মধ্যে মৃত্তিকা সকলের চেয়ে ভারি এবং সেইজন্যে তা জলে নিমগ্ন। এই ভূ-পিণ্ডই হলো জগতের কেন্দ্রস্থল। তার উপরে আছে জল এবং জল ভেদ করে এই পৃথিবী উঠেছে। এই মৃন্ময় পৃথিবী অন্যান্য মৌলিক পদার্থের চেয়ে ভারী হওয়ার জন্যে, সমস্ত জিনিষই পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে গমন করে এবং পৃথিবী এই সমস্ত গুরুভার বুকে নিয়ে আপনার ভারে আপনি অচল হয়ে আছে। সেইজন্যে পৃথিবী যে প্রদক্ষিণ করছে—তা হতে পারে না—চন্দ্র সূর্য্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে—সেইটেই সম্ভব হতে পারে।

তাঁর মত পণ্ডিত লোক পৃথ্বি-কেন্দ্রিক মতবাদ বিশ্বাস করতেন বলে, যখন এরিসটারর্কাস ঘোষণা করলেন যে, পৃথিবী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র নয়, সেও একটি গ্রহ, অন্যান্য গ্রহের মত সূর্য্যের চারদিকে ঘুরছে, তখন এরিসটার্কাসের কথা কেউ বিশ্বাস করলো না।

অন্ধকার যুগে বিজ্ঞান

যীশুখৃষ্ট জন্মাবার প্রায় একশো বছর আগে আলেকজান্দ্রিয়া রোমানদের অধিকারভুক্ত হয়। ধীরে ধীরে গ্রীসের গৌরবের যুগও অবসান হয়ে আসতে থাকে। গ্রীসের এই পতনের সঙ্গে সঙ্গে আলেকজান্দ্রিয়া—যে শহর এতদিন বিজ্ঞান-সাধনার কেন্দ্র ছিল—তারও গৌরব মলিন হয়ে আসতে লাগলো।

প্রাচীন রোমানরা সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, রাজ্য-গঠন প্রভৃতি ব্যাপারে খুব দক্ষ ছিল ; কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে তারা বিজ্ঞানকে ভালবাসতো না। ভার্জ্জিলের মত মহাকবি তাদের মধ্যে জন্মালো, সিসেরোর মত বড় বক্তা তাদের মধ্যে জন্মালো, টাসিটাসের মত ঐতিহাসিক তাদের মধ্যে জন্মালো—জুলিয়াস সীজারের মত বীর রাজনৈতিক এলো—কিন্তু কেউই বিজ্ঞান-চর্চ্চাকে প্রশ্রয় দিলেন না। তাঁদের মধ্যে না জন্মালো দার্শনিক, না জন্মালো বৈজ্ঞানিক।

নতুন শক্তির উন্মাদনায় রোমানরা তখন বিরাট রাজ্য সব জয় করে এক সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিল। দেশের সব বড় বড় লোক তখন রাজ্য-গঠনের ব্যাপার নিয়েই ব্যস্ত এবং বিজ্ঞানের যে দিকটার সঙ্গে রাজ্যগঠনের সাক্ষাৎ যোগ আছে, দেখা যায় যে শুধু সেই বিভাগেই একজন খুব প্রতিভাশালী লোক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম হলো ভিট্রুভিয়াস। তিনি ছিলেন সে যুগের সব চেয়ে বড় এঞ্জিনীয়ার।

রাজ্যগঠন করতে হলো সৈন্যদের যাবার জন্যে রাস্তা তৈরী করা চাই; নদীর ওপর সেতু তৈরী করা চাই, নগর বা দুর্গ-নির্ম্মাণ ব্যাপারে সুদক্ষ হতে হয়—রোমানরা তাই এ সব বিষয়ে খুব পারদর্শী ছিল। রোমান সম্রাট কনষ্টানটাইন এক-বার বলেছিলেন, **We need as many engineers as possible.**

যীশুখৃষ্ট জন্মাবার পূর্ব্বে প্রথম শতকেই ভিট্রুভিয়াস জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁর জীবন সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছুই জানা নেই। স্থপতিবিদ্যা সম্বন্ধে সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ তিনি একখানি বই রচনা করেন। সেই বইখানিই বহু যুগ ধরে য়ুরোপে স্থপতি-বিদ্যার একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছিল।

ভিট্রুভিয়াস ছাড়া আর দুজন রোমান বৈজ্ঞানিকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একজনের নাম হলো, Pliny the Elder—ইনি খৃষ্টাব্দের ২৩ বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন এবং Natural History বলে একখানি বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই বিরাট ইতিহাস ৩৭ খণ্ডে বিভক্ত এবং ঈশ্বর থেকে আরম্ভ করে পৃথিবী, নক্ষত্র, ভূমিকম্প, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা, ফল-ফুল, ধাতু প্রভৃতি বহু বিষয় সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা এই বিখ্যাত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। আজকাল এই ইতিহাসের সম্পূর্ণ ইংরাজী অনুবাদ পাওয়া যায়।

প্লিনির মৃত্যু-ঘটনা বড় রোমাঞ্চকর। তোমরা ভিসু-বিয়াসের অগ্ন্যুদ্গারের ব্যাপার নিশ্চয়ই জানো। যে-বার

ভিসুবিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে সমগ্র পম্পিয়াই শহর ভস্ম-নিমগ্ন হয়ে যায়—প্লিনি তখন পম্পিয়াই শহরে বাস করছিলেন। অগ্ন্যুৎপাতের লক্ষণ দেখেই তাঁর বৈজ্ঞানিকের মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। তিনি স্থির করলেন যে সাক্ষাৎভাবে তিনি পর্য্যবেক্ষণ করে দেখবেন, ব্যাপারটা কি হয়! তিনি সেই অগ্নি-উদ্গারী গিরির দিকে এগিয়ে চল্‌লেন কিন্তু সেই ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে সেদিন সমগ্র শহরকে বিলুপ্ত করে দিলো।

আর একজন যে বৈজ্ঞানিকের কথা বলছি—তাঁর নাম হলো, গ্যালেন। তবে তিনি জাতিতে রোমান ছিলেন না। তিনি সেই সময়কার সব চেয়ে বড় চিকিৎসক ছিলেন এবং চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি যে সব পুস্তক রচনা করে যান, তা বহুকাল পর্য্যন্ত য়ুরোপের চিকিৎসা-বিদ্যার ছাত্রদের পাঠ্য ছিল।

এই রোমান-রাজ্য কালক্রমে অসভ্য গথ, হুন প্রভৃতি জাতির দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং তাহার সাম্রাজ্য ও প্রতিষ্ঠা গ্রীসের মতই ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে আসে।

এইখানে তোমাদের আর একটা ঘটনার কথা বলা প্রয়োজন। সে হলো যীশুখৃষ্টের আবির্ভাব ও ক্রুশে তাঁর মৃত্যু। রোমান বিচারকদের বিচারের ফলে যীশুখৃষ্টের ক্রুশে মৃত্যু হওয়ার পর থেকে জগতে এক নতুন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হলো। তাদেরই বলে খৃষ্টান। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানরা ছিল পৌত্তলিক। খৃষ্টানরা এই পৌত্তলিকতার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। ধীরে ধীরে খৃষ্টান প্রচারকগণ সমগ্র য়ুরোপে তাঁদের

প্রভাব বিস্তার করতে লাগলেন। অনেক দেশের রাজা তাঁদের পুরানো ধর্ম্মমত ত্যাগ করে খৃষ্টান হলেন।

একদিকে এই বর্ব্বর জাতিদের আক্রমণ আর একদিকে নতুন খৃষ্টান শাসকদের গ্রীক পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মের উপর বিতৃষ্ণা—এই দুই মিলে কিছুকালের মত য়ুরোপের বিজ্ঞান সাধনার ধারাকে শুষ্ক করে তুল্লো। ইতিহাসে এই সময়কে বলে The Dark Ages অন্ধকারময় যুগ।

তখনও ক্রুশের উপর যীশুখৃষ্টের রক্ত হয়ত শুকোয় নি—তখনও হয়ত বৃদ্ধদের স্মৃতিতে যীশুর প্রতি সেই অমানুষ নির্য্যাতনের স্মৃতি বিমলিন হয় নি—সেই সময় নতুন যাঁরা খৃষ্টান হতে লাগলেন, তাঁরা পৌত্তলিক গ্রীসের সাধনাকে পাপ বলে বর্জ্জন করতে লোককে উপদেশ দিতে লাগলেন। একটা নতুন ধর্ম্মের প্রেরণায় লোকেও তখন সেই সব নতুন খৃষ্টানদের উপদেশ মন দিয়ে শুনতে লাগলো। ক্রমশঃ এই সব খৃষ্টান প্রচারকদের সঙ্গে গ্রীক পাণ্ডিত্যের শিষ্যদের ঘোরতর সংঘর্ষ দেখা দিতে লাগলো।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে জুষ্টিন মার্টার্ নামক একজন বিশিষ্ট খৃষ্টান নেতা প্রচার করলেন যে, গ্রীকরা যে-সব কথা বলে, সে সব ঢের ভালো করে বলা আছে বাইবেলে—প্রেরিত পুরুষদের বাণীতে। ক্লেমেণ্ট বলে আর একজন শক্তিশালী লোক তিনি বল্লেন যে, গ্রীক দার্শনিকেরা ছিল চোর আর ডাকাত—হিব্রু প্রেরিত-পুরুষদের বাণী চুরি করে তারা নিজের

বলে চালাতে চায়। ৪১৫ খৃষ্টাব্দে এক উত্তেজিত খৃষ্টান জনতা আলেকজান্দ্রিয়া শহরে থিওন বলে এক গ্রীক পণ্ডিতের মেয়ে-হাইপেসিয়াকে খণ্ড বিখণ্ড করে মেরে ফেলে। হাইপেসিয়ার অপরাধ ছিল যে তিনি গ্রীক-শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। অবস্থা ক্রমশঃ এমন হলো যে, বাইবেল ছাড়া অন্যান্য সমস্ত বই চর্চ্চার অভাবে বিলুপ্ত হয়ে যেতে লাগলো। এই নব ধর্ম্মের আন্দোলনে গ্রীসের বিজ্ঞান সাধনা তলিয়ে গেল।

য়ুরোপ যখন ধীরে ধীরে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল সেই সময় পূর্ব্ব থেকে একটা নতুন জ্ঞান সাধনার ধারা মৃত-প্রায় য়ুরোপের প্রাণে আবার নতুন স্পন্দন জাগিয়ে তুল্লে। পূর্ব্বের জ্ঞান-সাধনা নিয়ে অন্ধকারের অপমৃত্যুর হাত থেকে সেদিন য়ুরোপ রক্ষা পায় এবং পূর্ব্বের এই জ্ঞান-সাধনা য়ুরোপে নিয়ে আসে নবশক্তিতে, নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ আরবগণ।

পশ্চিম-আরবের সীমান্ত ত্যাগ করে অপরাজেয় অমিতবিক্রম এক মহাবাহিনী সেদিন দিগ্বিজয়ে বাহির হয়। সিরিয়ার ভিতর দিয়ে, এশিয়ামাইনর মেসোপটেমিয়া ছাড়িয়ে, আফ্রিকার মিশর, কার্থেজ, আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে ৭১১ খৃষ্টাব্দে আরব-বাহিনী জিব্রাণ্টার পার হয়ে স্পেনে আসে এবং সেদিন স্পেনে এক অভিনব সভ্যতার চরম বিকাশে সমস্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন য়ুরোপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আল-মনসুর থেকে আরম্ভ করে সেই সময়কার সমস্ত খলিফা জ্ঞান-বিজ্ঞান-অনুশীলনের জন্য, শুধু রাজার অন্তর নয়, রাজকোষও মুক্ত করে দেন।

সমগ্র য়ুরোপ থেকে পণ্ডিত সংগ্রহ করে এনে গ্রীক বিজ্ঞান দর্শন সমস্ত আরব ভাষায় অনুদিত করা হলো। বহু অর্থব্যয়ে বিলুপ্ত-স্মৃতি সব গ্রন্থ আবার সংগৃহীত হতে লাগলো। বিখ্যাত খলিফা আলমামুন বাগদাদে প্রাচীন মিশরের museumএর মত একটা বিরাট বিজ্ঞানশালা নির্ম্মাণ করালেন।

য়ুরোপ Algebraর জন্ম সেই সময়কার আরবদের কাছে ঋণী। কারণ য়ুরোপে তারাই প্রথম এই কথাটী প্রচলিত করায় ৮৩০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি আল কারিস্‌মি তাঁর বীজগণিত প্রকাশিত করেন। ঐতিহাসিকরা আজ একমত যে য়ুরোপে বীজগণিত আরবরা প্রবর্ত্তিত করলেও তার পূর্ব্বে আরবগণ হিন্দুদিগের কাছ থেকেই সে বিদ্যা আয়ত্ত করেন। আল-কারিস্‌মির বীজগণিত বিখ্যাত হিন্দু গণিতবিদ্ ব্রহ্মগুপ্তের পাটীগণিত ও বীজগণিতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই হলো ঐতি-হাসিকগণের সিদ্ধান্ত।

পদার্থ-বিদ্যায় আরবপণ্ডিত আল-হাজেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খুব সম্ভব ৯৬৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি তিনি জন্মগ্রহণ করেন। চক্ষুর গঠন, দৃষ্টি বা আলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা তাঁর পরবর্ত্তী য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। আরবদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনা এই সময় কি রকম ছিল তা গিবনের বিখ্যাত ইতিহাস থেকে নিচের এই কয়েকটী ঘটনা পড়লেই বোঝা যায়—

(১) কার্দোভা শহরে সূর্য্যাস্তের পর দশ মাইল লম্বা

রাস্তা সারারাত্রি হাতে-দেওয়া আলোতে আলোকিত হয়ে থাকতো। এর সাতশো বছর পরে লণ্ডনের রাস্তায় প্রথম দুএকটী করে আলো দেওয়ার সরকারী ব্যবস্থা করা হয়।

(২) একা কার্দ্দোভা সহরে তেরো হাজার তাঁত চলতো।

(৩) মুর শাসিত স্পেনের একটী লাইব্রেরীতে ছিল ৬ লক্ষ বই এবং একা আন্দুলেসিয়াতে ৭০টী লাইব্রেরী খোলা হয়।

(৪) একবার এক আরব ডাক্তারের বাড়ী বদলাবার দরকার হয়। শুধু তাঁর বই বইবার জন্যে চারশো উঠ লাগলো।

(৫) একবার একটী কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্যে একজন উজীর ২ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দান করে ছিলেন।

দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত য়ুরোপে আরব সভ্যতার এই দীপ্তি থাকে। তারপর ধীরে ধীরে গ্রীক-রোমান সভ্যতার মত, য়ুরোপে আরব সভ্যতাও হীনপ্রভ হয়ে আসতে থাকে এবং খৃষ্টানদের সঙ্গে ক্রমশঃ মুসলমানদের ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হল। ইতিহাসে এই সংঘর্ষ ক্রুসেড বলে খ্যাত। দুশো বছর ধরে য়ুরোপ এই ধর্ম্ম-যুদ্ধ বা ক্রুসেড চালায়।

তারপর ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে জড়তা-প্রাপ্ত য়ুরোপ আবার ধীরে ধীরে জাগতে আরম্ভ করে। তার নাবিকরা দূর সমুদ্র পার হয়ে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করতে লাগলো; দান্তে, পেত্রার্কের মত কবি নতুন সুরে অপূর্ব্ব সব কাব্য রচনা করলেন। মানুষের মন নতুন প্রেরণায় ভরে উঠলো—ডাভিঞ্চি, র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলোর মত চিত্রকরের তুলির স্পর্শে

মাটীর ঢেলায়, পাথরের টুক্‌রোতে স্বর্গের সুষমা ফুটে উঠতে লাগলো—চারিদিকে একটা জাগরণের সাড়া পড়ে গেল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই যে নতুন জাগরণ আরম্ভ হলো তারই নাম হলো রেনেসাঁন্স। বৈজ্ঞানিকও এই নবজাগরণের প্রেরণায় নতুন করে আবার প্রকৃতির চারিদিকে চাইলেন—বহুদিনের ভুল-দিয়ে-ভরা এই আকাশ আর পৃথিবীর সম্বন্ধ আবার তার চিত্তকে আকুল করে তুল্ল।

গ্যালিলিও

১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে ইতালীর পিসা নগরে গ্যালিলিও গেলিলি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল ভিন্‌সেনজো। দরিদ্র হলেও বংশ-মর্য্যাদায় তাঁরা কারুর থেকে ছোটো ছিলেন না।

ভিন্‌সেনজোর অঙ্কশাস্ত্রে আর সঙ্গীতে বিশেষ অনুরাগ ছিল। পিতার নিকট থেকে পুত্রও এই দুই বিদ্যায় শিশুকাল থেকেই পারদর্শিতা লাভ করেন।

ছেলেবেলায় গ্যালিলিও খেলাধূলো ছেড়ে খেলা-ঘরে বসে নানা রকমের সব কলকব্জা তৈরী করতেন—সেই ছিল বালকের সবচেয়ে আনন্দদায়ক খেলা। তাঁর পিতা বহুদিন ধরে বালকের এই যন্ত্রপাতির প্রতি অনুরাগ লক্ষ্য করছিলেন এবং মনে মনে শঙ্কিতও হয়ে উঠছিলেন। কারণ তখন বিজ্ঞানের কোনও মর্য্যাদা ছিল না—বিজ্ঞানের সেবা করে অন্নসংস্থান করা তখন একান্ত দুরূহ ব্যাপার ছিল। তখনকার বাপ মায়েরা চাইতো যে, ছেলে ডাক্তারী শিখুক—কেন না তখন ডাক্তারী বিষয়ের অধ্যাপকের বার্ষিক মাইনে ছিল—এখনকার আমাদের প্রায় ৬৫০০ টাকা, আর অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপকের মাইনে ছিল বার্ষিক ২৪০ টাকা অর্থাৎ মাসে ২০ টাকা মাত্র। সেইজন্যে ভেন-সেনজো ঠিক করলেন যে যেমন করেই হক—ছেলেকে তিনি ডাক্তারী পড়াবেন। ডাক্তারী পড়াবার জন্যে তাঁকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে দিলেন।

কিন্তু রক্তের-সঙ্গে-পাওয়া বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ গোপনে

গ্যালিলিও

কাজ করতে লাগলো। ডাক্তারী পড়ার অবসরে গ্যালিলিও পিতাকে না জানিয়ে রিসি বলে তখনকার একজন বিখ্যাত গণিত-বিদের কাছে ইউক্লিডের জ্যামিতি থেকে পাঠ নিতে আরম্ভ করলেন। ইউক্লিড শেষ করে তিনি আর্কিমিডিসের বইগুলো পড়তে স্বরু করলেন। অঙ্কশাস্ত্র আর পদার্থবিদ্যা তাঁর মনকে এমনভাবে টানতে লাগলো যে তিনি ডাক্তারী পড়া একরকম বন্ধ করে দিলেন এবং যথাসময়ে সে কথা তাঁর পিতার কাণে গিয়ে পৌঁছিল। অনেক চিন্তা করে তিনি দেখলেন যে স্বভাবের বিরুদ্ধে ছেলেকে শিক্ষা দিয়ে তিনি হয়ত তাঁর ক্ষতিই করতে চাইছেন। সেইজন্যে তিনি আর গ্যালিলিওর ওপর তাঁর নিজের মত চালালেন না। ডাক্তারী পড়া ছেড়ে দিয়ে গ্যালিলিও বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন করতে লাগলেন। অতি অল্প কালের মধ্যে সমস্ত অধ্যাপকের বিস্ময় উৎপাদন করে গ্যালিলিও উক্ত দুই বিষয়ে উপাধি অর্জ্জন করলেন। পিসা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তিনি অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক হলেন কিন্তু মাহিনা হলো সেই মাসিক কুড়ি টাকা।

গ্যালিলিও তাতেই সন্তুষ্ট। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি নানা বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। তখনও তাঁর কুড়ি বছর বয়স পূরে নাই—একদিন সন্ধ্যার সময় গির্জ্জায় আরাধনায় গিয়েছেন। সামনে মাথার ওপরে গির্জ্জার কড়িকাঠ থেকে আলোকাধারটী ঝুলছিল। তখন সবে মাত্র আলোটী জ্বালা হয়েছে—নীরবে সকলের মাথার ওপর তখনও হাতের দোলা

লেগে আলোকাধারটী দুলছিল—গ্যালিলিওর দৃষ্টি সহসা সেই দিকে গিয়ে পড়লো। এক হাত দিয়ে অপর হাতের নাড়ীর স্পন্দন গুণতে লাগলেন এবং সেই সঙ্গে ল্যাম্পটা কতবার দোলে তাই দেখতে লাগলেন। এইরকম ভাবে লক্ষ্য করে তিনি দেখলেন যে, জোরেই হক আর আস্তেই হক ল্যাম্পটী ঠিক সমপরিমাণ সময়েই এক দিক থেকে অপর দিকে যাচ্ছে। এখানে তোমাদের মনে রাখতে হবে যে তখন আজকালকার মত কলে-চলা ঘড়ি মানুষ তৈরী করতে শেখেনি। গ্যালিলিও নিজের নাড়ীর স্পন্দন দেখে তাই সময় নির্দ্ধারণ করছিলেন।

বাড়ী ফিরে এসে দড়িতে একটা ভারী জিনিস দুলিয়ে তিনি পরীক্ষা করতে লাগলেন—দেখলেন যে তাঁর অনুমান ঠিক—জোরেই হক আর আস্তেই হক জিনিষটী ঠিক সমপরিমাণ সময়েই একদিক থেকে অপর দিকে যাচ্ছে। এই থেকে তিনি পেণ্ডুলামের তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন এবং এই তত্ত্বকে বলে পেণ্ডুলামের সমগতিত্ব। এই তত্ত্ব আবিষ্কার হওয়ায় পরে কলে-চলা ঘড়ি তৈরী হওয়া সম্ভব হয়েছিল।

এই সময়ে একটা ব্যাপার নিয়ে পিসা শহরে বিষম গোলোযোগ উপস্থিত হলো। একথা তোমাদের আগে বলেছি যে, বিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত এরিষ্টটলকে তখনকার লোকে অভ্রান্ত জ্ঞানে শ্রদ্ধা করতো। তিনি অবশ্যই জগতের একজন সব চেয়ে বড় পণ্ডিত; কিন্তু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ব্যাপারে তাঁরও দু'একটী বিষয়ে ভ্রান্ত মত ছিল। কিন্তু সেকালের লোকেরা

এরিষ্টটলের সব কথাই অভ্রান্ত সত্য বলে মেনে নিত। গ্যালিলিও দেখলেন যে এরিষ্টটল একটা বিষয়ে মানুষকে অত্যন্ত ভুল শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

ধর, একটা খুব উঁচু-যায়গা থেকে যদি একটা এক সের ওজনের আর একটা দশ সের ওজনের ভারী জিনিস নীচে ফেলা যায়, তাহলে কোন্‌টা শীঘ্রির মাটিতে পড়বে ? সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় যে দশ সের ওজনের জিনিষটাই আগে মাটীতে পড়বে। গ্যালিলিও কিন্তু বললেন যে, না, তা হয় না, পতনশীল দ্রব্যের কতকগুলি নিয়ম আছে। সেই নিয়মের বশে, যদি বায়ুর প্রতিবন্ধক না থাকে, তবে ঐ এক সের ওজনের আর দশ সের ওজনের দুটো জিনিসই একই সঙ্গে মাটিতে পড়বে।

গ্যালিলিওর কথা শুনে পিসার জনসাধারণ থেকে শিক্ষিত লোকেরা পর্য্যন্ত হাসাহাসি করতে লাগলো। তারা বলাবলি করতে লাগলো যে নিশ্চয়ই অঙ্ক কসে কসে গ্যালিলিওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাদের এই অবিশ্বাস জন্মাবার আর একটা প্রধান কারণ ছিল যে, বহুকাল আগে এরিষ্টটল স্বয়ং বলে গিয়েছেন যে, যদি এক সের ভারী কোন জিনিস আর ধর দশ সের ভারী আর একটা জিনিস একই সময়ে একটা উঁচু যায়গা থেকে ফেলে দেওয়া যায়, তাহলে দশ সের ভারী জিনিসটাই আগে মাটিতে পড়বে।

গ্যালিলিও কিন্তু তাঁদের কারুরই কথা শুনলেন না— তিনি নিজের মনে, নিজের জ্ঞান-সাধনার ফলে প্রত্যক্ষভাবে

যেটাকে সত্য বলে জেনেছেন, লোকের ব্যঙ্গে বা উপহাসে তা অস্বীকার করবার মত মনোবৃত্তি তার ছিল না।

তিনি পিসার সমস্ত লোককে ডেকে তাদের সামনে পরীক্ষা করে তাঁর উক্তির সত্যতা প্রমাণ করবেন বলে ঘোষণা করলেন।

পিসার বিখ্যাত লিনিং টাওয়ারের কথা তোমরা শুনেছ। ঠিক হলো যে এই টাওয়ারের ওপর থেকে দুটো আলাদা ওজনের জিনিস নীচে মাটিতে ফেলে তিনি দেখিয়ে দেবেন যে তাঁর কথা সত্যি!

পরীক্ষার দিন সেই টাওয়ারের চারদিকে কৌতূহলী জনতা সমবেত হলো। গ্যালিলিও টাওয়ারের ওপর থেকে দুটী বিভিন্ন ওজনের জিনিস নীচে ফেলে দিলেন এবং দুটো জিনিসই এক সঙ্গে মাটিতে এসে পড়লো। আজ বিজ্ঞানের প্রত্যেক ছাত্রই এই পরীক্ষাটী কলেজে স্বচক্ষে দেখে থাকেন। একটা জায়গা থেকে যদি বায়ু নিষ্কাষণ করে দেওয়া হয়—তাহলে একখণ্ড কাগজ আর একটা টাকা এক সময় ছেড়ে দিলে ঠিক একই সঙ্গে মাটিতে এসে পড়বে।

কিন্তু সেদিন যারা গ্যালিলিওর এই পরীক্ষা দেখতে সমবেত হয়েছিলেন, তাঁরা চোখের সামনে দেখেও কোনও মতে তা বিশ্বাস করতে পারলেন না। বহুদিনের পুরাণো মতকে মন থেকে হঠাৎ ত্যাগ করতে মানুষ সহজে চায় না। তারা ভাবলো যে এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন জুয়াচুরি বা চালাকী আছে।

এই ব্যাপারের পর থেকে পিসা শহরে তাঁর বাস করা কঠিন হয়ে উঠলো। চারদিকে লোকে তাঁকে ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ করে। এই সময় তাঁর সংসারে এক মহাবিপত্তি দেখা দিল। তাঁর পিতা এই সময় পরলোকগমন করলেন। সামান্য কুড়ি টাকা মাহিনা—তার ওপর সংসারে একটী ভাই ও তিনটী ভগিনী। কোনও রকমে গ্রাসাচ্ছাদন হয় মাত্র। এই অবস্থায় তাঁকে চাকরীটীও বাধ্য হয়ে ত্যাগ করতে হলো।

সেই সময় পাদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা তাঁর কথা শুনে বুঝতে পারেন যে লোকটী প্রতিভাবান্। তাঁরা সেই নিদারুণ দুঃসময়ে তাঁকে তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেকে পাঠালেন। পিসা নগর ত্যাগ করে গ্যালিলিও পাদুয়া-বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্ক শাস্ত্রের অধ্যাপক হলেন এবং এখানে আঠারো বৎসর কাল একাদিক্রমে কাজ করেন।

এই পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করবার সময়ে গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। যে-যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ এতদিন পরে লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে আকাশের কোলে অবস্থিত অন্যান্য পৃথিবীর রহস্য প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারে গ্যালিলিও হলেন তাঁর জন্মদাতা।

যৌবনের প্রথমদিন থেকেই সৌরমণ্ডলের রহস্য তাঁরও মনকে আকৃষ্ট করে। যে প্রশ্ন মীমাংসার জন্য যুগ যুগ ধরে এত চেষ্টা চলে আসছে, যে প্রশ্নের উত্তরের জন্য মানুষ কারাগার বরণ করেছে, জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ হয়ে মরেছে, আজীবন

নির্ব্বাসিতের জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে—কোনও দিন কি তার স্থির মীমাংসা হবে না ?

গ্যালিলিও জীবনের প্রথম দিন থেকেই কোপার্নিকাসের মত মানতেন—তিনি বিশ্বাস করতেন যে এই পৃথিবী সচলা আর ঐ সূর্য্য স্থির। আমাদের এই পৃথিবীই একটা নির্দ্দিষ্ট পথে সূর্য্যের চারদিকে ঘুরছে। কিন্তু এই মত প্রচারের ফলে তাঁর পূর্ব্বাপর পণ্ডিতগণের যে দুর্দ্দশা হয়েছিল তার খবর তিনি জানতেন ; তাই এ সম্বন্ধে প্রকাশ্যে তাঁর মত ঘোষণা করতে তাঁর শঙ্কা হতো ; তবে তিনি গোপনে এই সম্বন্ধে সমস্ত তত্ত্ব সংগ্রহ করতে লাগলেন।

যখন তিনি পৃথিবী ও তার সহিত অন্যান্য গ্রহের সম্বন্ধ নির্ণয়ে ব্যস্ত, তখন তিনি হঠাৎ একদিন একটা মজার খবর শুনলেন। খবরটা হলো এই,—হল্যাণ্ড দেশে জ্যানসন ও লিপার্‌ল নামে দুজন চসমা বিক্রেতা ছিল। একদিন জ্যানসনের ছেলেরা দুখানা আতসী কাঁচ নিয়ে খেলা করতে করতে দেখে যে, যখন তারা কাচ দুখানি একভাবে ধরে তখনই তার ভেতর দিয়ে দেখে যে সামনের গির্জ্জেটে খুব কাছে দেখাচ্ছে আর গির্জ্জের চূড়োটা উল্টো দিকে দেখা যাচ্ছে। ছেলেগুলো অবাক হয়ে ব্যাপারটা এসে তাদের বাবাকে দেখায়। জ্যানসনও দেখলেন, ব্যাপারটা তো সত্যিই মজার। ব্যবসায়ী লোক, তখন কাচ দুখানি একখানা কাঠে বসিয়ে জ্যানসন আর লিপার্‌ল ছেলেদের জন্যে একটা নতুন রকমের খেলনা তৈরী করে বিক্রী করতে লাগলেন।

এই মজার ব্যাপারটী লোকের মুখের কথায় কথায় গ্যালিলিওর কাছে এসে পৌঁছল। কথাটা শুনে অবধি তাঁর মনে এক প্রবল চাঞ্চল্য উপস্থিত হলো। মনে হলো যেন ভগবান কোন্ বিপুল বিরাট রহস্য তাঁকে জানিয়ে দেবার জন্য একটা ইঙ্গিত পাঠিয়ে দিয়েছেন। যদি দূরের গির্জ্জা এতো নিকটে দেখা যায়, তবে এই কাঁচেরই সাহায্যে হয়ত একদিন ঐ দূরের আকাশের বুকে যারা এতদিন ধরে লুকিয়ে আছে, তাদের খবর পাওয়া যাবে ? এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি চসমার সেই দুরকম কাচ, একটাকে বলে উন্নতোদর অর্থাৎ Convex আর একটাকে বলে concave অর্থাৎ নতোদর ; এই দুরকম লেন্স নিয়ে নানারকমের যন্ত্র তৈরী করতে লাগলেন। একদিন একটা ভাঙ্গা অর্গানের নলের একমুখে এই convex লেন্স আর আরএক মুখে concave লেন্স বসিয়ে উৎসুক হয়ে তার ভেতর দিয়ে দূরের দিকে চাইলেন।

আনন্দে তাঁর সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ দিয়ে উঠলো ; এইতো, সত্যিই তো, দূরকে কাছে পাবার, যাকে চোখে দেখা যায় না, তাকে দেখবার পথ ভগবান দেখিয়ে দিলেন। আরও তাঁর আনন্দ লাগলো যে, তাঁর যন্ত্রে সেই চসমাওয়ালার খেলনার মত সব উল্টো দেখায় না, স্বাভাবিক সোজাভাবেই দেখা যায়।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই,—সাধারণ আতসী কাচ তোমরা সকলেই দেখেচ। সেটা হলো উন্নতোদর লেন্স। যদি এই আতসী কাচের দ্বারা সূর্য্যরশ্মি সংযত করা যায়, তাহলে সূর্য্যের একটা

ছোট গোল সাদাছবি অপর দিকে পড়ে। তখন সেটা হয় উল্টো। এই উল্টো ছবি আর একখানি উন্নতোদর লেন্সের ভেতর দিয়ে দেখলে সেটাও উল্টো এবং বড় দেখাবে। দিক্‌দর্শন যন্ত্রে একখানি উন্নোতদর আর একখানি নতোদর লেন্স ব্যবহৃত হয় বলে ছবি সোজা দেখা যায়। চসমাওয়ালা দুখানা কাচই উন্নতোদর ব্যবহার করেছিল বলে ছবি উল্টো দেখাচ্ছিল।

এই সত্যের আবিষ্কার করে গ্যালিলিও পাতুয়া ছেড়ে ভেনিসে এলেন এবং সেখানে স্বহস্তে শক্তিশালী লেন্স দিয়ে প্রথম দিগ্‌দর্শন যন্ত্র তৈরী করলেন।

দিগ্‌দর্শন যন্ত্র তৈরী করে তিনি সেই যন্ত্রের সাহায্যে আকাশের দিকে চাইলেন। এতদিন পর্য্যন্ত যে রহস্য মানুষের চাক্ষুষ জ্ঞানের বাইরে ছিল—প্রথম সেদিন রাত্রে গ্যালিলিও ভেনিসের কোন এক বিলুপ্ত-স্মৃতি অট্টালিকার ওপরে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সেই রহস্য দেখলেন। কত হাজার যুগ ধরে চাঁদ এমনি আকাশে ভেসে চলেছিল—কত কবি কত কল্পনা দিয়ে তাকে সৃষ্টি করেছিল—কিন্তু সেদিন প্রথম মানুষ সাক্ষাৎ ভাবে তাকে দেখলো—না আছে তাতে সুধা, না আছে তার কোলে হরিণ বসে। সমস্ত ভেনিস যখন নিদ্রায় আচ্ছন্ন তখন গ্যালিলিও রাতের পর রাত চাঁদের দিকে চেয়ে চেয়ে থাকতেন—আর তাঁর চোখের সামনে মানুষের-অদেখা নতুন নতুন পৃথিবী নব নব রহস্য নিয়ে ফুটে উঠতো। তিনি দেখলেন

যে, আমাদের এই পৃথিবীর মতই চাঁদেও আছে, পাহাড়-পর্ব্বত, উপত্যকা আর সমতল ভূমি। এমন কি সেই সব পাহাড় কত উঁচু তাও তিনি মাপতে আরম্ভ করলেন। তিনি আরও প্রচার করলেন যে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত করে চাঁদ যেমন আলো দেয়, তেমনি আমাদের এই পৃথিবীও আলো দেয়। আমাদের এই পৃথিবীর জ্যোৎস্না চাঁদে গিয়ে পড়ে বলে, তৃতীয়া চতুর্থীর চাঁদের অপর অংশ অস্পষ্ট দেখা যায়।

গ্যালিলিওর এই সব সিদ্ধান্ত শুনে পণ্ডিতরা শুধু বিস্মিত নয়—ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। যতই দিন যেতে লাগলো গ্যালিলিও সম্বন্ধে তাঁদের ততই ধারণা হতে লাগলো যে লোকটা হয় পাগল নয় বদমায়েস, নাস্তিক তো বটেই। কেন না বাইবেলে বলা হয়েছে যে, এই পৃথিবী হলো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র আর চন্দ্র সূর্য্য তাকে ঘিরে ঘুরছে। চাঁদ ছিলো দেবতা—এই চাঁদকে নিয়ে কত কবি কত কাব্য রচনা করে গিয়েছেন—এ বলে কিনা চাঁদটা জড়পিণ্ড!

পণ্ডিত আর ধর্ম্মযাজকরা যখন এই রকম ভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিলেন, গ্যালিলিও তখন আপনার দিগ্‌দর্শন যন্ত্রটী নিয়ে অসীম আকাশের রহস্য ভেদ করবার জন্যে ব্যস্ত ছিলেন।

চাঁদকে ছেড়ে তিনি আকাশের চারদিক দেখতে লাগলেন। গ্রীষ্মকালের পরিস্কার নীল আকাশে তোমরা হয়ত লক্ষ্য করে দেখেছ যে, নীল আকাশের মাঝখান দিয়ে একটা শাদা পথের মত রেখা মাঝে মাঝে দেখা যায়। তাকে সাধারণতঃ আমরা

বলি ছায়াপথ। কবিরা কল্পনা করেছেন যে নীল আকাশের বুকে সেই শুভ্র পথ হলো স্বর্গের রাজ-পথ—দেবতারা ঐ পথে বিচরণ করেন। গ্যালিলিও তাঁর যন্ত্রের সাহায্যে দেখলেন যে যেটাকে এতদিন লোকে স্বর্গের রাজপথ বলে কল্পনা করে এসেছে, আসলে সেখানে অসংখ্য তারা ভিড় করে রয়েছে—তাই সে যায়গাটাকে ঐ রকম শাদা দেখায়।

এর পরেও গ্যালিলিও আর একটী নতুন তথ্য আবিষ্কার করলেন। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে তিনি বৃহস্পতি গ্রহ, ইংরেজীতে যাকে **Jupiter** বলে, সেই গ্রহ পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ করেন। এই গ্রহ পর্য্যবেক্ষণ করবার সময় তিনি দেখতে পেলেন যে সেই গ্রহটীর খুব কাছে আরও ছোট ছোট তিনটী তারা রয়েছে। ৭ই জানুয়ারী তিনি ব্যাপারটী প্রথম লক্ষ্য করেন। তখন বৃহস্পতির বাঁদিকে ছিলো দুটো তারা আর ডানদিকে ছিল একটা তারা। পরের দিন দেখেন যে ঐ তিনটে তারাই ডানদিকে চলে এসেছে। ৯ই তারিখে আকাশ মেঘে-ভরা থাকার দরুণ সে রাত্রে তিনি আর কিছুই দেখতে পেলেন না। ১০ই তারিখে দেখেন যে সে দুটো তারা বাঁদিকে চলে এসেছে। এমনি তিনি রাতের পর রাত পর্য্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে চারটী তারা অনবরত বৃহস্পতির চারদিকে ঘুরছে। এই ব্যাপার থেকে গ্যালিলিও সৌরমণ্ডলের আর একটা নতুন সত্য আবিষ্কার করলেন। আমাদের পৃথিবীর চারদিকে যেমন চাঁদ ঘুরছে—তেমনি বৃহস্পতির চারদিকেও এমনিতর চাঁদ

ঘুরছে—তবে একটা নয়, চার চারটে। তারা হলো বৃহস্পতির উপগ্রহ। বৃহস্পতি হলো পৃথিবীর মতই আর একটা গ্রহ, এবং আয়তনে এই পৃথিবীর চেয়ে অনেক গুণ বড়।

এবারে তিনি তাঁর দিগ্‌দর্শনযন্ত্র সূর্য্যের দিকে ফেরালেন। পরীক্ষা করতে করতে তিনি দেখলেন যে সূর্য্যের মধ্যে কতকগুলো দাগ দেখা যাচ্ছে। এই দাগগুলো সকল সময় এক রকম থাকে না। তিনি বহুদিন ধরে পর্য্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে এই দাগগুলো ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে গিয়ে আবার আটাশ দিনের দিন দেখা দেয়। এই থেকে গ্যালিলিও সিদ্ধান্ত করলেন যে আটাশ দিনে সূর্য্য নিজের মেরুদণ্ডের ওপর একবার ঘুরে আসে।

যৌবনের প্রথম দিন থেকে অনবরত পরিশ্রমে গ্যালিলিওর শরীর ভেঙ্গে আসছিল—আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ক্রমশঃ তাঁর দৃষ্টিও ম্লান হয়ে এসেছিল। নিজের বিজ্ঞান-চর্চ্চা ছাড়া এই সময় তাঁকে নিয়মিত ছাত্রদের বক্তৃতাও দিতে হতো। সেই সময় ফ্লোরেন্সের শাসনকর্ত্তা তাঁর বন্ধু দ্বিতীয় কস্‌মো তাঁকে ফ্লোরেন্সে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। বিশ্রামের আশায় গ্যালিলিও সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। কিন্তু পাতুয়ায় তাঁর বন্ধুরা তাঁকে বার বার করে নিষেধ করলো যে তিনি যেন পাতুয়া ত্যাগ না করেন। তার কারণ হলো পাতুয়া ছিল ভেনিস্ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত—সেখানে রোমান ক্যাথলিকদের সর্ব্বময় কর্ত্তা পোপের কোনও বিশেষ ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু

ফ্লোরেন্স হলো পোপের শাসনের অধীন। বন্ধুদের আশঙ্কায় কর্ণপাত না করে ক্লান্ত বৈজ্ঞানিক বিশ্রামের জন্যে ফ্লোরেন্সে এলেন।

ফ্লোরেন্সে এসে প্রথম প্রথম তিনি বেশ শান্তিতেই ছিলেন। তাঁর খ্যাতি য়ুরোপের চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। রাজ-সভায়ও তাঁর সম্মান হলো। গ্যালিলিওর যত মান-সম্ভ্রম বাড়ে, ধর্ম্মযাজকদের ততই অশান্তি আর মর্ম্মপীড়া হয়। অবশেষে তাঁরা মিলিত হয়ে পোপের কাছে আবেদন করলেন যে, গ্যালিলিও বাইবেল-বিরুদ্ধ কোপার্নিকাসের মত প্রচার করছেন—এজন্যে তাঁর বিচার হওয়া আবশ্যক।

১৬১৫ খৃষ্টাব্দে পোপ পঞ্চম পল তাঁকে রোমে ডেকে পাঠালেন। বিন্দুমাত্র শঙ্কিত না হয়ে গ্যালিলিও তাঁর যন্ত্র-পাতি সব সঙ্গে নিয়ে রোমে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে তিনি পোপকে স্বমতে আনতে পারবেন।

রোমে উপস্থিত হয়ে তিনি তাঁর যন্ত্র দিয়ে স্বয়ং পোপকে তাঁর আবিষ্কৃত সব তথ্যের ব্যাপার দেখালেন। দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের সাহায্যে আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করে পোপ দেখলেন যে গ্যালিলিওর কথাই সত্য। তাতে তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। তারা তখন বলতে লাগলো যন্ত্র দিয়ে যা দেখা যায় যাক্—কিন্তু এই পৃথিবী যে সচল একথা প্রচার করা বাইবেলের প্রচারিত উক্তির বিরুদ্ধ সুতরাং ধর্ম্মবিরুদ্ধ; সে সম্বন্ধে গ্যালিলিওর কি মত তা জানা দরকার। ধর্ম্মযাজকদের

নিকোলাস কোপার্নিকাস

পীড়াপীড়িতে এক বিচার সভা বসলো এবং তাতে স্থির হলো যে কোপার্নিকাস মত প্রকাশ করেছেন যে, পৃথিবী অচলা নয়, তা ভ্রান্ত এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ। কোপার্নিকাসের গ্রন্থ পোপ আইন করে বন্ধ করে দিলেন। গ্যালিলিওর প্রতি আদেশ হলো যে তিনিও ভবিষ্যতে যেন এই মত আর প্রচার না করেন। ভগ্নহৃদয় নিয়ে গ্যালিলিও আবার ফ্লোরেন্সে ফিরে এলেন।

১৬২৩ খৃষ্টাব্দে পোপ পঞ্চম পল দেহত্যাগ করেন। তাঁর যায়গায় পোপ হলেন সপ্তম আর্ব্বান। এই সপ্তম আর্ব্বান ছিল গ্যালিলিওর বিশেষ বন্ধু। পোপের পদে বন্ধুকে দেখে গ্যালিলিও আশান্বিত হয়ে তাঁর এত দিনের সাধনা লিপিবদ্ধ করলেন। গ্রন্থটীর নাম দিলেন "টলেমী ও কোপার্নিকাসের জ্যোতিষ সম্বন্ধে আলোচনা।" তিনজনের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে গ্যালিলিও কৌশলে কোপার্নিকাসের মতই প্রচার করেন। এই তিনজন ব্যক্তির মধ্যে একজন হলো কোপার্নি-কাসের মতাবলম্বী আর একজন মূর্খ বিদূষক আর তৃতীয় ব্যক্তি হলো, কোপার্নিকাসের মতের বিরুদ্ধবাদী।

এই বই বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মযাজকদের ক্রোধ শত-শিখায় জ্বলে উঠলো। পূর্ব্বতন পোপের আদেশ অমান্য করে গ্যালিলিও ছল করে আবার সেই বাইবেল-বিরুদ্ধ মত প্রচার করছেন!

গ্যালিলিওর তখন সত্তর বছর বয়স—চোখের দৃষ্টি ঝাপ্সা

হয়ে আসছে। সেই সময় ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী রোম থেকে হুকুম এলো যে, তাঁকে রোমে এসে ইনকুইজিশন নামক বিচারালয়ের সম্মুখে বিচার গ্রহণ করতে হবে। মধ্যযুগে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মদ্বেষিগণের জন্য যে বিচারালয় ছিল তাকেই ইনকুইজিশন বলা হতো।

বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক বিচারকদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। আজীবন নিরুৎসাহে আর বাধায় গ্যালিলিওর মন ভেঙ্গে গিয়েছিল। ওধারে বৃদ্ধের একমাত্র স্নেহের বন্ধন তাঁর কন্যা তাঁকে ধর্ম্মযাজকদের কথায় মত দিতে অনুরোধ করে বারে বারে পত্র পাঠাচ্ছিলেন। ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে বৃদ্ধ বাইবেল শপথ করে সেদিন বলতে বাধ্য হলেন, "সূর্য্য জগতের কেন্দ্রস্থল একথা আদৌ সত্য নয়। এই পৃথিবীই হলো জগতের কেন্দ্রস্থল। আর এই পৃথিবী সচলা নয়—এ পৃথিবী হলো স্থির, স্থাণু। আমি এতদিন যে ধারণা পোষণ করে এসেছি তা সম্পূর্ণ অসত্য এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে ভবিষ্যতে আর কোনও দিন লিখিত বা মৌখিক ভাষায় এর অন্যথা আমি করবো না।"

চোখের সামনে স্পষ্ট দেখছি, অন্ধপ্রায় বৃদ্ধ কাঁপতে কাঁপতে রোমের সেই বিচারালয় থেকে বেরিয়ে আসছেন—মুখে অস্পষ্টভাবে তাঁর আজীবনের সাধন-লব্ধ বাণী শোনা গেল—তবুও পৃথিবী ঘুরছে!

অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়ে গ্যালিলিও অবরুদ্ধ অবস্থায় সীনা

নামে এক গ্রামে অবস্থান করতে লাগলেন। জীবনের একমাত্র স্নেহ-বন্ধন তাঁর কন্যাটীও এই সময় দেহত্যাগ করে। বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের অন্তর একেবারে ভেঙ্গে পড়লো।

এই অবস্থার মধ্যে থেকেও গ্যালিলিও গতিশীল দ্রব্যের গতি সম্বন্ধীয় নিয়ম সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করে এক খানি গ্রন্থ রচনা করলেন। বর্ত্তমান Dynamics অর্থাৎ গতিবিজ্ঞানের সেইটীই হলো ভিত্তি। কিন্তু তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশ করলেন না। গোপনে সেখানি তিনি তাঁর এক ছাত্রের কাছে রেখে দিলেন।

ইতালীর সীমানা পরিত্যাগ করে হল্যাণ্ডে গিয়ে ছাত্রটী সেই গ্রন্থ পরে প্রকাশিত করেন।

ক্রমে গ্যালিলিও একেবারে অন্ধ হয়ে গেলেন। এই সময় তিনি তাঁর এক প্রিয় বন্ধুকে একখানি চিঠিতে লেখেন "আজ আমি অন্ধ! একদিন যে-আকাশকে আমি সকলের সঙ্গে পরিচিত করে দিয়েছিলাম সেই আকাশ আজ আমারই দৃষ্টির সম্মুখে রুদ্ধ!"

এই সময় ইংলণ্ড থেকে এক তরুণ কবি এই অন্ধ বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের কথা শুনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তার নাম হলো মিণ্টন। তোমরা জানো যে মিণ্টনও জীবনের শেষ ভাগে অন্ধ হয়ে যান—হয়ত তখন তাঁর মনে যৌবনে-দেখা সেই অন্ধ বৈজ্ঞানিকের কথা মনে পড়তো!

অবশেষে ১৬৪২ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী তাঁর মুক্তির সংবাদ

এলো! পোপের অনুশাসন, অজ্ঞানতার শত উৎপীড়ন, সকলের সীমা অতিক্রম করে জগতের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক চির-মুক্তি অর্জ্জন করে অনন্তলোকে প্রয়াণ করলেন।

ধর্ম্মযাজকরা অনুশাসন দিলেন যে খৃষ্টান-রীতি অনুসারে তাঁকে কবর দেওয়া চলতে পারে না। কিন্তু তাতে তাঁরা অকৃতকার্য্য হলেন। তখন তাঁরা সুর তুললেন যে গ্যালিলিওর কবরের ওপর কোনও স্মৃতি-ফলক দেওয়া হবে না।

অজ্ঞ ধর্ম্মযাজকরা জানতেন না, একটুকরো স্মৃতি-ফলকের কোন প্রয়োজন গ্যালিলিওর ছিলনা। আকাশের চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র যাঁর স্মৃতিফলক—একটুকু কাঠের বা পাথরের স্মৃতি-চিহ্ন থাকুক বা না থাকুক তাতে তাঁর কি যায় আসে?

সার আইযাক নিউটন

নিউটন

নিউটন আর আপেল ফল পড়ার গল্প প্রত্যেক ছাত্রই আজ জানেন। কি কারণে আপেল ফল মাটীতে এসে পড়ে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মধ্যে বহু যুগের বিজ্ঞান সাধনার একটা মীমাংসা সেদিন হয়ে গিয়েছিল।

নিউটন যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন মনে হয়. বিধাতার সকল রকম অভিশাপ যেন তাঁর ওপর ছিল। তাঁর জন্মাবার কয়েকমাস আগেই তাঁর বাবা মারা যান এবং তিনি যে ভাবে জন্মগ্রহণ করলেন, তাতে কেউই ভাবে নি যে তিনি বেশীদিন বেঁচে থাকবেন। ছোট্ট একটা মাংসের ঢেলা! তাঁর মা বলতেন,—এত ছোট যে একটা বোতলে বোধহয় পূরে রাখা যেত! কে জানতো যে সেই ছোট মাংসের পিণ্ড একদিন বিশ্ব জগতে যুগান্তর আনবে।

মায়ের বহু চেষ্টায় সেই ছোট মাংস পিণ্ডটুকু হাত পা নেড়ে ক্রমশঃ ঘুরে বেড়াতে শিখলো। নিউটন দিদিমার স্নেহক্রোড়ে মানুষ হতে লাগলেন।

তাঁর ছেলেবেলাকার জীবন সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু জানা নেই। তবে প্রথম প্রথম স্কুলে যে তিনি খুব ভাল ছেলে ছিলেন এ রকম খবর পাওয়া যায় না। একবার এক খেলায় একজন সহপাঠী অন্যায় ভাবে রেগে গিয়ে তাঁকে ভয়ানক নির্য্যাতন করে। তাঁর গায়ের জোর তেমন ছিল না। মনের

দুঃখে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে যেরকম করেই হোক ক্লাসে সেই ছেলেটার ওপরে উঠতে হবে। এই না ঠিক করে তিনি পড়াশোনায় বিশেষ করে মন দিলেন। খেলাধূলা ছেড়ে রাতদিন পরিশ্রম করতে লাগলেন এবং যখন দেখলেন যে সত্যিই সেই পরিশ্রমের ফলে শুধু সেই ছেলেটার ওপরে নয়, অন্য অনেক ছেলের ওপরে তিনি উঠে গেলেন—তখন জয়ের আনন্দে তাঁর মন ভরে উঠলো। পড়াশোনায় তাঁর মন লাগলো এবং সেই সঙ্গে বুঝলেন যে পরিশ্রম করলেই তার পুরস্কার পাওয়া যায়।

নিউটনের তখন পনেরো বছর বয়স। সহপাঠীরা খেলধূলা করে কিন্তু নিউটন আপনার মনে অবসর সময়ে অঙ্ক কসেন। অঙ্ক কসতে যখন আর ভাল লাগে না তখন কিশোর চিত্ত খেলায় মাতে কিন্তু সে সম্পূর্ণ নতুন রকমের খেলা। নানা যায়গা থেকে বালক নানা রকমের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করেছিল; যখনই খেলতে ইচ্ছে যেতো তখনই বালক সেই যন্ত্রের বাক্স নিয়ে নিজের খেয়াল খুসীমত নানারকমের জিনিস তৈরী করতো। সেই ছিল ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের কিশোরকালের খেলা।

তাঁর মার ইচ্ছা অনুসারে নিউটন দিদিমার আশ্রয় থেকে তাঁর কাছে এলেন। স্কুলের পড়াশুনাও গেল বন্ধ হয়ে।

তাঁদের অবস্থাও খুব খারাপ ছিল। মার তখন 'চিন্তা' কি করে সংসার চলে। তিনি স্থির করলেন যে ছেলেকে লেখা-পড়া শিখিয়ে কি হবে—আর শেখানোই বা হয় কি করে!

বরঞ্চ চাষবাসের কাজে যদি এখন থেকেই লাগিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে অন্ততঃ দুবেলা দুমুঠো খাবার সংগ্রহ করতে পারবে।

এই স্থির করে তিনি একজন বুড়ো চাষার তত্ত্বাবধানে নিউটনকে দিলেন। জগতের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের কাজ হলো, প্রত্যেক শনিবার হাটে গিয়ে সেই বুড়ো চাষার ক্ষেতের উৎপন্ন শস্য বিক্রী করা।

যেই বুড়ো চোখের আড়াল হতো, নিউটন ঝুড়ির ভিতর থেকে যন্ত্রপাতি বার করে আপনার কাজে লেগে যেতেন। বিক্রেতার ব্যাপার দেখে ক্রেতারা নানা রকমের সুবিধে নিতে ছাড়তো না। বুড়ো কিছুদিন পরে হতাশ হয়ে নিউটনের মাকে জানালেন যে, ও-ছেলেকে দিয়ে তরী-তরকারী বিক্রী করান চলবে না।

সে কাজের বদলে নিউটনের নতুন কাজ হলো—গরু ছাগল চরান।

নিউটনের হলো আরও সুবিধে। মাঠে গরু ছাগল আপনার মনে চরে বেড়ায়—নিউটন বেশ একটা নির্জ্জন যায়গা দেখে বই খুলে বসে পড়েন। আশেপাশের চাষারা সুবিধে পেলো। তারা মিথ্যে করে দু'বেলা মালিকের কাছে নালিশ করতে লাগলো যে, তাঁর গরু-ছাগল এসে তাদের ক্ষেতের শস্য নষ্ট করে দিয়েছে। যে রাখালটাকে তিনি রেখেছেন সে কিছুই দেখে না। এই ভাবে কেউ কেউ ক্ষতিপূরণও আদায় করে

নিতো। মালিকটী দেখলেন এতো মন্দ বিপত্তি নয়। অবশেষে নিউটনের সে চাকরীটিও গেল।

ছেলেকে নিয়ে তাঁর মা বড়ই মুস্কিলে পড়লেন। এই সময়ে নিউটনের এক আত্মীয় নিউটনের কথা শুনে ব্যাপারটা সমস্ত বুঝলেন। তিনি বুঝলেন যে ছেলেটীর প্রতিভা আছে। তাকে এভাবে কাজে লাগিয়ে নষ্ট করা উচিত হবে না।

তাঁরই চেষ্টার ফলে ১৬৬১ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন নিউটন ক্যাম্ব্রিজের বিখ্যাত Trinity Collegeএ ভর্ত্তি হলেন।

এই কলেজে ভর্ত্তি হবার কয়েক দিন পরেই জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রথম বইএর সাক্ষাৎ পেলেন। আকাশের নক্ষত্রের আর এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কথা পড়তে পড়তে নিউটনের মনের সম্মুখে একটা নতুন জগতের দরজা যেন খুলে গেল। একেবারে তন্ময় হয়ে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান পড়তে আরম্ভ করলেন।

কিন্তু পড়তে পড়তে দেখলেন যে জ্যামিতি ভালো করে না জানলে জ্যোতির্বিজ্ঞান বোঝবার অসুবিধে হবে। কালবিলম্ব না করে নিউটন বইএর দোকান থেকে একখানা ইউক্লিডের জ্যামিতি কিনে আনলেন।

বাড়ীতে এসে মিনিট পনরো ধরে ইউক্লিডের সমস্যাগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে বইখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। অন্যলোকের যে সব সমস্যা অনেকদিন ধরে পড়ে বুঝতে হতো, নিউটনের কাছে সে সমস্ত নিতান্ত সোজা ব্যাপার ছিল। তিনি ভেবেই পেলেন না, এই সব সোজা জিনিষ বোঝাবার জন্য ইউক্লিড

কেন এত পরিশ্রম করেছেন—এসব তো অতি সোজা কথা, সবারই জানা উচিত।

ইউক্লিডের জ্যামিতি ত্যাগ করে নিউটন তার চেয়ে কঠিন যে বই, ডেকার্ত্তের জ্যামিতি, তাই কিনে পড়তে আরম্ভ করলেন। ডেকার্ত্তের জ্যামিতি তাঁর মনকে অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি আরও গভীর ভাবে আকর্ষণ করলো। সমস্যা যত জটীল হয়, তার সমাধন করতে নিউটনের তত আনন্দ লাগে। যোদ্ধার যেমন যুদ্ধ জয় করে আনন্দ হয়, তেমনি অঙ্কশাস্ত্রের কঠিনতম সমস্যাগুলি সমাধন করতে নিউটনের আনন্দ হতো।

পঁচিশ বছর বয়সে তিনি Trinity Collegeএর সদস্য নির্ব্বাচিত হলেন এবং তার দুবছর পরে অর্থাৎ সাতাস বছর বয়সে নিউটন ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিশেষ অধ্যাপকের আসন গ্রহণ করেন।

অধ্যাপক হয়ে নিউটনকে সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন করে ছাত্রদের নিকটে বক্তৃতা দিতে হতো। বাকি সময় তিনি আপনার গবেষণার কাজে ব্যস্ত থাকতেন।

সেই সময় তিনি আমাদের সূর্য্যের যে শুভ্র আলো সেই বিষয় নিয়ে গবেষণা করছিলেন এবং ছেলেদের বক্তৃতার বিষয়ও সেইজন্যে স্থির করেন আলোক-তত্ত্ব।

তার আগে অধ্যাপকরা এই আলোক-তত্ত্ব সম্বন্ধে সে-সব কথা বলতেন ছাত্ররা বিস্মিত হয়ে গেল যে সেই তরুণ অধ্যাপক সে কথা তো বলেনই না বরঞ্চ তার উল্টা কথা বলতে

লেগেছেন। তারা এতদিন ধরে জেনে এসেছিল প্রতিদিন প্রভাতে যে সূর্য্যের আলো পৃথিবীকে ভরিয়া তোলে, তার রঙ হলো শাদা—কেন না প্রত্যক্ষ চোখের সামনেই তাই-ই তো দেখা যায়। নিউটন এসে বল্লেন, তা নয়, ঐ শাদা রঙের মধ্যে আছে সাত সাতটা বিভিন্ন রঙ—রক্ত, অরুণ, পীত, হরিৎ, নীল, ইণ্ডিগো ও ভায়লেট।

এই অদ্ভুত কথা ক্রমশঃ সদ্য-প্রতিষ্ঠিত রয়েল সোসাইটীর কাণে গিয়ে উঠলো। এখানে তোমাদের রয়েল সোসাইটীর কথা একটু বলা দরকার।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে বৈজ্ঞানিকগণ এক রকম কারুর সাহায্য না নিয়েই নানা বিষয়ে সব নতুন নতুন গবেষণা করছিলেন। তাঁদের এই বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টাকে সেই সময়কার লোকে সাহায্য করা দূরে থাকুক রীতিমত ব্যঙ্গ করতো। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও একই বিষয় নিয়ে নানা রকমের মতদ্বৈধ দেখা দিতো। এইসব কারণে বৈজ্ঞানিকেরা অনেক দিন থেকেই ভাবছিলেন যে, বিজ্ঞান সাধনার জন্যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক মিলে একটা সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা করা দরকার। এই রকম ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারলে যেমন সত্যাসত্য বিচারের একটা সুবিধা হবে; তেমন সেই সঙ্গে বিজ্ঞান আলোচনার ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকেরা একটা প্রেরণা পাবেন।

এই ভাবে সেদিন সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে য়ুরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানগুলির জন্ম হয়। সর্ব্ব প্রথম

ইতালীর নেপল্‌স্‌ শহরে ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে প্রাকৃতিক বিষয় সম্বন্ধে গবেষণা কার্য্যে উৎসাহ দেবার জন্যে একটী একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইংলণ্ডে ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি বৈজ্ঞানিকরা সমবেত হয়ে গ্রেস্‌হাম কলেজে একটা সমিতি গড়ে তোলেন। এই সমিতির নাম দেওয়া হয়, Invisible College অদৃশ্য কলেজ। এই "অদৃশ্য কলেজের" ব্যাপার নিয়ে সেই সময়কার লোকে নানা রকমের ঠাট্টা করতো। সেই সময়কার লেখকেরা এই সমিতির সদস্যদের ব্যঙ্গ করে লিখতেন যে, 'পোকা; মাকড়, শামুক, ছারপোকা আর হাওয়া নিয়ে যারা জীবন কাটিয়ে দিল, তারা কষ্ট করে লেখাপড়া শিখলো কেন?' কিন্তু আজ এই সমিতির সদস্য হওয়া মানে বৈজ্ঞানিক জগতের সব চেয়ে বড় সম্মান লাভ করা। এই "অদৃশ্য কলেজই" কিছুকাল পরে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের অনুজ্ঞাক্রমে জগতে বিখ্যাত রয়েল সোসাইটী নামে ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে রূপান্তরিত হয়। এই সমিতির সদস্যদেরই বলে Fellow of the Royal Society, সংক্ষেপে F. R. S., বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জগতে এই সব চেয়ে বড় সম্মান। ভারতবর্ষে মাত্র তিনজন F. R. S. আছেন, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা এবং স্যার সি, ভি, রমণ।

আমি যে সময়ের কথা বলছি সে সময় এই রয়েল সোসাইটী সবে মাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিউটনের এই নতুন আবি-

ষ্কারের কথা তাঁদের কাণে গিয়ে পৌঁছিল। তাঁরা এই খবর শুনে ভাবলেন হয় লোকটা সত্যিই খুব বড় রকমের একটা সত্য আবিষ্কার করেছে, নয় লোকটা পাগল।

নিউটন আলোক-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর নতুন গবেষণা রয়েল সোসাইটীর সামনে বিবৃত করলেন এবং শুধু বিবৃত করলেন, তা নয়, একটা কাঁচের তিন কোণা কলমের মধ্যে সূর্য্য-রশ্মি ধরে চোখের সামনে তাঁর আবিষ্কারের সত্যতা প্রমাণ করে দিলেন। এই আলোক-তত্ত্ব আবিষ্কার সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। নিউটন যখন ছাত্র ছিলেন তখন থেকেই আলোর বর্ণ-তত্ত্বের দিকে তাঁর নজর ছিল এবং সেই সময় থেকেই তিনি এ বিষয়ে গবেষণা করতে থাকেন। তাঁর শিক্ষকও তখন আলোর বর্ণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করছিলেন। এই গবেষণার ব্যাপারে তিনি নিউটনের সাহায্য প্রায়ই নিতেন। নিউটন কিন্তু সেইদিন থেকেই বুঝেছিলেন যে শিক্ষক মহাশয় যা গবেষণা করছেন তা সর্ব্বৈব ভুল। তিনি সংগোপনে নিজে এই সম্বন্ধে গবেষণা করতে লাগলেন। নিউটন তখন Trinity College এর সদস্য। প্রায় কুড়ি বচ্ছরের প্রতিদিনের সাধনার ফলে তিনি অবশেষে তাঁর সমস্ত গবেষণা লিপিবদ্ধ করতে বসলেন। বই প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় কেমন করে আগুন লেগে সমস্ত খাতাপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কেমন করে এ আগুন লাগলো তা কেউ বলতে পারে না। তবে তাঁর প্রিয় কুকুর ডায়মণ্ড সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে—সেটা সত্যি নয়। এই গল্পেতে বলা

হয় যে, ডায়মণ্ড টেবিলের আলো উল্টিয়ে দেয় এবং তাতে করে আগুন ধরে উঠে। সে যাই হোক, যখন সেই সব খাতাপত্তরে আগুন ধরে তখন নিউটন বাড়ীতে ছিলেন না। আগুন দেখে তাঁর ছাত্ররা ছুটে এসে দেখে সেই কুড়ি বচ্ছরের বৈজ্ঞানিক সাধনা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ভয়ে আর আশঙ্কায় তাদের বুক শুকিয়ে গেল। তারা ভাবলো যে নিউটন এসে যখন দেখবেন যে এই কাণ্ড হয়েছে—তখন নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যাবেন।

বাড়ী ফিরে এসে নিউটন সমস্তই দেখলেন, কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। সেই ভস্মস্তূপের দিকে যেয়ে শুধু বল্লেন, আবার নতুন করে সব করতে হবে। এবং তাই করলেন।

অতি সূক্ষ্ম সব জটীল গণনা আবার তিনি করলেন। এই পরম ধৈর্য্য হলো শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের বিশেষত্ব এবং নিউটনের চরিত্রের এই হলো বিশিষ্টতা। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের তিনি প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন বলে নয়, তাঁর অসাধারণ চরিত্রগুণেও নিউটন জগৎ-বরেণ্য হয়ে আছেন।

আলোর বর্ণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা শুনে রয়েল সোসাইটী ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁকে উক্ত সমিতির সদস্য করেন। নিউটন যখন রয়েল সোসাইটীর সদস্য হন, তখন তাঁর বয়স মাত্র বত্রিশ।

নিউটন আলোক-বিশ্লেষণ করে দেখান যে সূর্য্যের আলোতে সাতটা রঙ আছে। এখানে তোমাদের নিউটনের এই আলোক-বিশ্লেষণের ব্যাপার সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটু বলি।

আমাদের চোখের সামনে যে জিনিষটা থাকে আমরা চোখ চাইলেই তাকে দেখতে পাই। এই যে দেখার ব্যাপার, এটাকে বিশ্লেষণ করে বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়েছেন যে, আমাদের চোখ আর আমরা যে জিনিষটাকে চোখ দিয়ে দেখছি তার মাঝখানে অদৃশ্য বায়ুরূপে আর একটা জিনিষ আছে, তার নাম হলো ঈথার। এই ঈথার না থাকলে আমরা দেখতে পেতাম না। তোমরা দেখেছো যে জলে যদি একটু ঘা দেও, তাহলে জলের ওপরে ঢেউ জন্মায়; তেমনি আমরা যে জিনিসটা দেখছি, সেই জিনিষটার গায়ে আহত হয়ে এই ঈথার-সরোবরে তরঙ্গ ওঠে। এই তরঙ্গগুলি আবার আমাদের চোখের পরদায় এসে ধাক্কা দেয়। তোমরা ভাবছো হয় ত, এ সব কাল্পনিক কথা কিন্তু এই ঈথার-ঢেউগুলির দৈর্ঘ্য কত, মিনিটে কতবার ধাক্কা খাচ্ছে এবং এই ধাক্কা খাওয়ার পর যে তরঙ্গ উঠে আমাদের চোখের পরদায় এসে লাগে, তার বেগ কত—তা সমস্তই নিখুঁত ভাবে মেপে বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়েছেন।

জলে একটা ঢিল ছুঁড়লে তোমরা লক্ষ্য করে থাকবে যে জলের ওপরে নানা রকমের ঢেউ ওঠে—কোন ঢেউটা লম্বা লম্বা, কোনটা একটু বড়, কোনটা বা একটু ছোট। তেমনি বস্তুর দ্বারা আহত হয়ে ঈথারে যে তরঙ্গ ওঠে, তারও মধ্যে নানা রকমের ঢেউ আছে। এই সব ছোট বড় ঢেউ চোখের অতি সূক্ষ্ম স্নায়বীয় পর্দ্দায় এসে আঘাত করে—ঢেউএর গঠনের তারতম্য হিসেবে বোধের তারতম্য জন্মায়; সুতরাং

রঙটা হলো চোখের স্নায়ু আর ঈথারের তরঙ্গ এই দুটো জিনিষের যোগাযোগের ব্যাপার। তোমরা শুনে হয় ত বিস্মিত হবে, যে জিনিসটা দেখছি—রঙটা তার নয়। বিভিন্ন রকমের ঢেউ বিভিন্ন রকম ভাবে আমাদের চোখের পর্দ্দায় আঘাত করে বলেই আমরা বিভিন্ন রঙের অস্তিত্ব বুঝতে পারি।

সূর্য্যের আলোতে এই রকম ছোট বড় সব ঈথারের তরঙ্গ আছে। এই সাদা আলোতে যে সব ঢেউ বর্ত্তমান, তার কোন কোনটাকে বেছে নিলেই রঙিন আলো পাওয়া যায়। এই বেছে নেওয়াকেই আলোক-বিশ্লেষণ বলে। নিউটন যে উপায়ে এই আলোক বিশ্লেষণ করে রঙিন আলোর অস্তিত্ব দেখান তা হচ্ছে এই—

সূর্য্যের আলো-কে কোনও মতে বায়ু থেকে জল, তেল বা কাচের মত স্বচ্ছ-পদার্থের ভেতর নিয়ে গেলে, দেখা যায় যে, নতুন জায়গায় গিয়ে ঢেউগুলো সব ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। যখন এইভাবে ঢেউগুলো ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, তখন তাদের মধ্যে থেকে একটাকে বা কতক গুলিকে বেছে নেওয়া যায়—এবং এইরূপ ভাবে আলোক বিশ্লেষণ করলেই বিভিন্ন রঙের অস্তিত্ব দেখা যায়। কাচের ভেতর সূর্য্যের আলো ধরে নিউটন সূর্য্যের শাদা আলোয় সাতটী রঙের অস্তিত্বের প্রমাণ করেন।

চোখের সামনে যা দেখছি তা শাদা এক-রঙা, তাকে কিনা বিশ্বাস করতে হবে বহু-রঙা বলে? নিউটনের এই নতুন

আবিষ্কারের কথা শুনে সেই সময়কার পণ্ডিত আর দার্শনিকরা নিউটনের ওপর ভীষণ চটে গেলেন। তাদের প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে নিউটন বিরক্ত হয়ে পড়লেন। এই সময়ে দুঃখ করে তিনি বলেন, আলো সম্বন্ধে এই নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করার ফলে চারদিক থেকে লোকে আমাকে এত ব্যতিব্যস্ত ও উত্যক্ত করে তুল্লো যে সেদিন মনে মনে নিজেকেই ধিক্কার দিলাম—কেন আমার নির্জ্জন পড়ার ঘর ছেড়ে বাইরের লোকের কাছে বিদ্যে জানাতে এলাম। নতুন কিছু যাঁরা আবিষ্কার করেন, তাঁদের দুর্ভাগ্য যে, তাঁরা যে জিনিষ আবিষ্কার করেন তার সত্যতা প্রমাণ করবার জন্যে তাঁদের সেই তথ্যের দাস হয়ে থাকতে হয়।

এরপর একটা ঘটলো যাতে নিউটনের চিন্তাধারা অন্য আর একদিকে চল্লো।

সেই সময় ক্যাম্ব্রিজে প্লেগ দেখা দিল। নিউটন ক্যাম্ব্রিজ ত্যাগ করে তাঁর জন্মভূমি উল্‌স্‌থলপে এলেন। এইখানে একদিন তিনি বাগানে বসে আপনার মনে ভাবছিলেন। এমন সময় হঠাৎ সামনের আপেল গাছ থেকে একটা পাকা আপেল মাটিতে পড়ে গেল। ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়—জগতে নিত্য ফল পাকে এবং পাকলেই তা মাটিতে পড়ে—কত সহস্র লোক কত সহস্রবার এই ব্যাপার দেখেছে কিন্তু এই নিয়ে কেউ কোনও দিন কিছু ভাবে নি—ভাববার প্রয়োজনও বোধ করে নি। কিন্তু সেদিন হঠাৎ আপেল ফল মাটিতে পড়তে দেখে

নিউটনের মনে একটা প্রশ্ন জাগলো, ফল বৃন্তচ্যুত হয়ে মাটিতে পড়লো কেন ?

এই সামান্য ঘটনা সেদিন নিউটনের মনে যে চিন্তাধারা জাগিয়ে দিল, তার ফলে তিনি জগতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন। এতদিন ধরে দেশে দেশান্তরে যুগে যুগান্তরে পণ্ডিতেরা যে সমস্যার কোনও সমাধান করতে পারেন নি—কি নিয়মে সমগ্র গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চলেছে—এতদিন পরে নিউটন সেই সমস্যার সমাধান করলেন। মাধ্যাকর্ষণ কথাটীর সঙ্গে নিউটনের নাম অক্ষয় হয়ে গেল ; এবং আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হলো।

এখানে তোমাদের একটা কথা বলে রাখি। এই যে আপেল-পড়ার গল্প যা আমরা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি এর কোনও ভিত্তি নেই। জগতে বহুদিন থেকে বহু পণ্ডিত এই রহস্যের সন্ধানের জন্য সাধনা করে গেছেন—সেই সময়কার বৈজ্ঞানিক জগতে নিউটনের সেই প্রশ্নটাই ছিল সকল বৈজ্ঞা-নিকের মনে—তার জন্যে আপেল ফল পড়ার কোনও দরকার ছিল না। বিখ্যাত ফরাসী মনীষি ভল্‌টেয়ার প্রথম এই গল্পটা চালান—তারপর প্রতিবাদহীন ভাবে এই গল্পটী চলে আসছে।

নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার সম্বন্ধে আলোচনা করবার আগে এখানে তাঁর আগেকার কয়েকজন বৈজ্ঞানিকদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার।

তোমরা কোপার্নিকাসের কথা শুনেছ। বহুদিন ধরে মানুষ আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করে কিছুই স্থির করতে পারে নি—কি নিয়মে তারা চলাফেরা করে।

কোপার্নিকাস্ এসে বল্লেন যে গ্রহ-নক্ষত্রদের গতির মধ্যে কোনও জটিলতা নেই। পৃথিবী থেকে আমরা দেখি বলে অনেক সময় গ্রহদের চলাফেরা আমাদের জটিল লাগে। কারণ পৃথিবী সূর্য্যের চার দিকে ঘুরছে। আমরা যদি কোনও রকমে সূর্য্যে যেতে পারি তা হলে সেখান থেকে দেখতে পাব যে সূর্য্যকে কেন্দ্র করে কি সুশৃঙ্খলায় গ্রহ-উপগ্রহরা চলা-ফেরা করছে। এখানে তোমাদের কোপার্নিকাসের জীবন সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

প্রুসিয়ার অন্তর্গত থর্ন নামক শহরে ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে নিকোলাস্ কোপার্নিকাস্ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, সে সময় লোকে সৌরমণ্ডল সম্বন্ধে টলেমীর সিদ্ধান্তই সত্য বলে মেনে নিয়েছিল অর্থাৎ এই পৃথিবী হলো সৌর-জগতের কেন্দ্র ; চন্দ্র সূর্য্য সকলেই এই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। কিন্তু কোপার্নিকাস্ এসে প্রথম সেই বিশ্বাসের ভিত্তি ভেঙ্গে দিয়ে সৌরমণ্ডল সম্বন্ধে বর্ত্তমানে আমরা যে ধারণা পোষণ করি, তার প্রতিষ্ঠা করে গেলেন। অবশ্য তখনই লোকে তাঁর কথা

শোনে নি এবং তাঁকে এই মত প্রচার করার দরুণ সাক্ষাৎ ভাবে যদিও কোন নির্য্যাতন সহ্য করতে হয় নি—তবুও তাঁর পরে যে সব বৈজ্ঞানিক তাঁর মতকে সত্য বলে প্রচার করতে চেয়েছেন, তাঁদের অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে—এমনি কি তাদের কারুর কারুর মৃত্যুদণ্ড হয়েছে।

যে-সময়ের কথা আমি বলছি সে-সময় য়ুরোপের বিভিন্ন রাজ্যে ধর্ম্মযাজকদের বিশেষ প্রভাব ছিল। তাঁরা বিজ্ঞানকে সন্দেহের চোখে দেখতেন এবং মনে করতেন যে, বিজ্ঞানের সঙ্গে খৃষ্ট-ধর্ম্মের বিরোধ আছে। বাইবেলে যখন লেখা আছে এই পৃথিবী হলো সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র তখন তার বিপক্ষে কোন কথা বলা ছিল, ঘোরতর পাপকার্য্য।

কোপার্নিকাস্ যৌবনে ডাক্তারী বিদ্যা অধ্যয়ন করেন কিন্তু ধীরে ধীরে আকাশের চন্দ্র-সূর্য্য-তারা তাঁর মনকে টানতে লাগলো। তিনি ডাক্তারী পরিত্যাগ করে জ্যোতির্ব্বিদ্যা আলোচনায় আত্মনিয়োগ করলেন।

তাঁর এক কাকা ধর্ম্মযাজক ছিলেন। তাঁর সহায়তায় ও পরামর্শে কোপার্নিকাস্ একটী শহরের ধর্ম্মযাজকের পদ নিলেন। নিজের বিলাস-বাসনার দিকে তাঁর আদৌ কোন দৃষ্টি ছিল না। সেই জন্য এই ধর্ম্মযাজকের কাজ তাঁর জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্র আলোচনার পক্ষে খুব সুবিধাজনক হলো। তিনি প্রচুর অবকাশ পেলেন।

এই অবসরের সময় নিজের ঘরের দেওয়ালে আকাশের

বড় বড় ম্যাপ এঁকে কোপার্নিকাস্ গভীর গবেষণায় নিমগ্ন থাকতেন এবং বহুদিনের সাধনার পর তিনি যুগান্তকারী তাঁর সিদ্ধান্ত প্রকাশ করলেন, যে—পৃথিবী স্থাণু নয়, এই সৌর-মণ্ডলের কেন্দ্রও নয়, সে সামান্য একটী গ্রহমাত্র—সূর্য্যের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কোপার্নিকাসের এই কথা শুনে সেদিন য়ুরোপে এক তুমুল আন্দোলন দেখা দিল।

কোপার্নিকাসের অনেক শিষ্য য়ুরোপে জুটে গেল। যদিও তিনি সাক্ষাৎভাবে ধর্ম্মসম্বন্ধে কোনও আলোচনা করেন নি, তবুও তাঁর শিষ্যেরা এই নতুন বৈজ্ঞানিক-জ্ঞানের প্রেরণায় সমাজের ও প্রচলিত ধর্ম্মের অনেক ব্যাপারে প্রশ্ন করতে লাগলেন। বিজ্ঞানের দিক থেকে যেমন পুরোনো আদর্শ ভেঙ্গে তাঁরা একটা নতুন আদর্শ গ্রহণ করলেন, তেমনি ধর্ম্ম ও সমাজের দিকে থেকে তাঁরা অনেক পুরোনো ব্যবহারের প্রতিবাদ করতে লাগলেন। তার ফলে ধর্ম্মযাজকদের সঙ্গে এই নব্য বৈজ্ঞানিকদের একটা বিরোধ বেঁধে গেল।

এই নব্য বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে ব্রুনো নামে একজন ছিলেন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মযাজকদের বিচারের ফলে জীবন্ত অবস্থায় তাঁকে মেরে ফেলা হয়।

১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে কোপার্নিকাস্ তাঁর বই প্রকাশিত করেন। তখন তিনি রোগশয্যায়। প্রতিমুহূর্ত্তে উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষায় আছেন—তাঁর আজীবনের সাধন-লব্ধ ধন—তাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত

NICOLAI CO
PERNICI TORINENSIS
DE REVOLUTIONIBUS ORBI-
um coelestium, Libri VI.

Habes in hoc opere iam recens nato, & aedito,
studiose lector, Motus stellarum, tam fixarum,
quàm erraticarum, cum ex ueteribus, tum etiam
ex recentibus obseruationibus restitutos: & no-
uis insuper ac admirabilibus hypothesibus or-
natos. Habes etiam Tabulas expeditissimas, ex
quibus eosdem ad quoduis tempus quàm facilli
me calculare poteris. Igitur eme, lege, fruere.

Norimbergae apud Ioh. Petreium,
Anno M. D. XLIII.

কোপার্নিকাসের পুস্তকের 'মুখপত্র'

দেখবার জন্যে। কিন্তু তাঁর অসুখ সহসা অত্যন্ত বেড়ে উঠলো। যখন মৃত্যু-দূতের ছায়া তাঁর ঘরে এসে পড়েছে তখন তাঁর বই এলো। তাঁর চোখের সামনে একখানা বই তুলে ধরা হলো কিন্তু তখন চোখে তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। কোনও রকমে হাত দিয়ে বইখানা স্পর্শ করলেন—মাতা যেমন সন্তানকে শেষ স্পর্শ করে।

কোপার্নিকাসের মৃত্যুর তিন বছর পরে ডেনমার্কের কোপেন-হেগেন শহরে আর একজন বড় বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোপার্নিকাসের অসমাপ্ত কাজকে আরও অনেকটা দূর পর্য্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যান। তাঁর নাম হলো টাইকোব্রাহী।

টাইকোব্রাহী আকাশের জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কার করলেন এবং তারা কোথায় কি ভাবে আছে —তা নিরাকরণ করে আকাশের একটা ম্যাপ তৈরী করলেন।

এই সময় এক ভোজ-সভায় আর একজন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে কোনও একটা বিষয় নিয়ে তাঁর ঘোরতর দ্বন্দ্ব লাগে। তর্ক ক্রমশঃ দ্বন্দ্ব যুদ্ধে পরিণত হল এবং এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধে টাইকো-ব্রাহীর নাক একদম কেটে যায়। পরে তিনি তৈরী-করা একটা নাক ব্যবহার করতেন।

টাইকোব্রাহীর জ্যোতির্ব্বিদ্যায় চমৎকৃত হয়ে রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক তাঁকে Heven বলে এক দ্বীপে একটা বিরাট প্রাসাদ তৈরী করে দিলেন। সেই প্রাসাদের নাম হলো

Uraniborg অর্থাৎ স্বর্গ নগরী। সেই স্বর্গ-নগরীতে থেকে রাজার অনুগ্রহে টাইকোব্রাহী আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। কথিত আছে যে প্রতিদিন যখন টাইকো-ব্রাহী তাঁর শয়নঘর থেকে কাজ-করবার-ঘরে প্রবেশ করতেন—তিনি রাজকীয় বেশে নিজেকে বিভূষিত করতেন—রাজায় রাজায় যেমন দেখা হয়, তেমনি তিনি নিজেকে মনে করতেন যে, এই পৃথিবীর প্রতিনিধি রাজা হয়ে তিনি চলেছেন আকাশের দেশের রাজার সঙ্গে দেখা করতে।

কিন্তু দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের মৃত্যুর পর যিনি রাজা হলেন তিনি বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক আদৌ ছিলেন না। স্বর্গ-নগরী থেকে তিনি টাইকোব্রাহীকে তাড়িয়ে দিলেন। নিজের বইপত্র আর যন্ত্রপাতি নিয়ে টাইকোব্রাহী জার্ম্মাণীতে পালিয়ে এলেন। যে বছরে ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হয়, তার এক বছর পরে তিনি প্রাগ সহরে দেহত্যাগ করেন।

তারপর এলেন কেপলার। কেপলার এসে জানালেন যে গ্রহরা যে পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে চলে তা ঠিক গোলাকার নয়—অনেকটা ডিমের মত। এই রকম পথকে জ্যামিতিতে Ellipse অর্থাৎ বৃত্তাভাস বলে। কেপলার গ্রহগণের গতির সম্বন্ধে কয়েকটা নিয়ম আবিষ্কার করেন।

গ্রহগণ বৃত্তাভাস পথে ঘুরছে এবং সূর্য্য থেকে দূরত্ব হিসাবে গ্রহদের গতির পার্থক্য হয়। যে যতদূরে আছে, তাকে এক

ট্রাইকোব্রাহী ১০২

পাক ঘুরে আসছে, তত অধিক সময় লাগে এবং আপন আপন পথে থেকে দূরত্ব হিসেবে তারা নির্দ্দিষ্ট চক্কর ফেরা করছে।

নিউটন এসে অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে একেবারে নিখুঁত ভাবে কসে দেখিয়ে দিলেন যে—কে কতদূরে, কি ভাবে ঘুরছে! প্রত্যেকের ঘোরার সঙ্গে প্রত্যেকের কি সম্বন্ধ, সে সমস্ত তিনি নিখুঁত ভাবে দেখিয়ে দিলেন। এতদিন ধরে মানুষ গ্রহ-নক্ষত্রদের সম্বন্ধে শুধু কল্পনাই করে এসেছিল, নিউটন এসে বিজ্ঞানের সাহায্যে হাতে-কলমে এই সৌরমণ্ডলের অন্তর্নিহিত সমস্ত রহস্যের একটা ছক কেটে মানুষের সামনে ধরলেন। তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে প্রত্যেক গ্রহ নির্দ্দিষ্ট পথে—নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ও নির্দ্দিষ্ট কালে সূর্য্যকে কেন্দ্র করে পরিভ্রমণ করে। তিনি শুধু এই সূত্র বল্লেন তা নয়, কি সে, নিয়ম ? সে কালের কি পরিমাণ এবং সে পথের কি রীতি সমস্তই হিসেব-নিকেষ করে দেখিয়ে দিলেন। সংক্ষেপে নিউটনের বিখ্যাত সূত্রটী হলো—গ্রহের প্রতি সূর্য্যের অভিমুখে একটা আকর্ষণ-বল আছে—যে গ্রহের দূরত্ব যত অধিক; এই আকর্ষণ-বলের পরিমাণ দূরত্বের বর্গ অনুসারে তত অল্প।

কেপলার প্রভৃতি তাঁর আগেকার বৈজ্ঞানিকরা জানতেন যে গ্রহগণ যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করছে ঠিক সেই নিয়মেই চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। নিউটন এসে তার ওপরে বল্লেন যে ঠিক সেই নিয়মেই আপেল ফল পৃথিবীর দিকে পড়ছে বা আকৃষ্ট হচ্ছে। নিউটন এসে দেখালেন

যে জড় জগতের সর্ব্বত্র—জড়দ্রব্য মাত্রেরই গতিতে সেই একই নিয়মে কাজ করছে। কামানের গোলা ছুঁড়লে যে নিয়মে সে গোলা বেঁকে যায়—ঠিক সেই একই নিয়মে চাঁদ আকাশে বৃত্তাভাস পথে ঘুরছে—সেই একই নিয়মে ডাল থেকে পাকা ফল মাটীতে পড়ছে। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমরা প্রত্যেকেই এক অমোঘ গতির নিয়মে বাঁধা। সেই নিয়মই হলো—মাধ্যাকর্ষণ শক্তি।

১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে নিউটন তাঁর বিখ্যাত বই Principia প্রকাশিত করেন। সমস্ত জগতের মধ্যে এই বই একটা নতুন যুগ এনে দিল। এই বই এতো বিক্রী হয় যে ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে এমন হলো যে য়ুরোপের কোথাও এর একখানা কিনতে পাওয়া যায় নি।

দেখতে দেখতে নিউটনের খ্যাতি সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের জন্যে তিনি Master of Mint ট্যাকশালের সব চেয়ে বড় পদ পেলেন। সেখানে দুবৎসর কাজ করার পর তিনি কেনসিংটনের গ্রাম্য প্রকৃতির মধ্যে অধ্যয়ন আর বিশ্রামের জন্যে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। সেই সময় তিনি রয়েল সোসাইটীর সভাপতি মনোনীত হন এবং যতদিন বেঁচে ছিলেন, প্রত্যেক বছর—পঁচিশ বৎসর কাল ধরে তিনি উক্তপদে বারবার মনোনীত হন। ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে ১৬ই এপ্রিল রাণী অ্যানে স্বয়ং নিউটন যে কলেজ থেকে শিক্ষা লাভ করেন, সেই ট্রিনিটি কলেজে

এসে সেখানে একটি বিশেষ দরবার বসিয়ে নিউটনকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন।

যে লোক জগতের সভ্যতার ইতিহাসে একটা নতুন যুগ আনলেন—ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর চেয়ে অমায়িক, বিনয়ী, মিতব্যয়ী এবং অভিমানশূন্য লোক জগতে খুব কম দেখা গিয়েছে। শুধু বৈজ্ঞানিক হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবেও নিউটন জগতের সকল জাতির সকল শ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করে গিয়েছেন। নিউটন যে-যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে যুগের আবহাওয়াতে একটা নৈতিক অবনতির বিষ-বাষ্প ছিল—কিন্তু তার একবিন্দুও নিউটনকে স্পর্শ করতে পারে নি। আপনার বৈজ্ঞানিক চিন্তায় তিনি এতদূর তন্ময় থাকতেন যে, খাওয়ার বা স্নানের কথা ভুলেই যেতেন। তাঁর এক প্রিয় ভৃত্য ছিল—তার কাজ ছিল প্রভুর পেছনে পেছনে ঘুরে খাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। কেনসিংটনের বাগানে প্রায়ই দেখা যেতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিউটন আপনার মনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর তাঁর পিছনে পিছনে প্রভুভক্ত ভৃত্য মৃদুস্বরে বলছে—খাবার সময় হয়ে গেছে।

এত বড় অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ কিন্তু তিনি বৃহত্তর সমস্যা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতেন যে জীবনের ছোটখাটো বিষয়ে অনেক সময় তিনি হাস্যকর ভুল করতেন। তাঁর একটা প্রিয় বিড়াল ছিল। ঘরের দরজা বন্ধ করে তিনি যখন কাজ করতেন শুধু সেই বিড়ালটী সেই ঘরে থাকতো। বাইরে যাবার জন্যে চেঁচামিচি

করে পাছে তাঁর ব্যাঘাত জন্মায় বলে, তিনি বেড়ালটার বাইরে যাবার জন্যে দরজার মধ্যে একটা গর্ত্ত করে দিয়েছিলেন। বেড়ালটা সেইখান দিয়ে যাতায়াত করতো।

কিছুদিন পরে বেড়ালটার অনেকগুলো বাচ্ছা হয়। পাছে বাচ্ছাগুলো বাইরে যাবার জন্যে চেঁচামিচি করে সেই জন্যে নিউটন দরজায় আর একটা গর্ত্ত করে দিলেন। তাঁর ধারণাই হলো না যে, ঐ আগেকার একটা গর্ত্ত দিয়েই তারা যাতায়াত করতে পারে!

১৭২৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চ পঁচাশী বছর বয়সে পরিপূর্ণ যশ ও সম্মানের মধ্যে নিউটন দেহত্যাগ করেন। ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার আবেতে যেখানে ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষিগণ চিরনিদ্রায় নিমগ্ন আছেন সেইখানে রাজকীয় গৌরবের সঙ্গে নিউটনকে সমাহিত করা হয়।

মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যুগস্রষ্টা মহাজ্ঞানী অনুতাপ করে বলেন—"জানিনা জগৎ আমাকে কি ভাবে দেখবে। কিন্তু আমার মনে হয়, আমি বালকের মত জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে বসে শুধু ঝিনুক আর নুড়ি নিয়েই খেলা করে গেলাম—সামনে আমার জ্ঞান-সমুদ্র তেমনি অনাবিষ্কৃত হয়েই পড়ে রইল।"

পরিশিষ্ট

কণাদ—মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক দর্শন নামক হিন্দুদর্শনের একটী বিশিষ্ট শাখার প্রণেতা। ইনিই সর্ব্বপ্রথম পরমাণুবাদ—ইংরাজীতে যাহাকে atomic theory বলে, প্রচার করেন। মহর্ষি কণাদের মতে পরমাণু নিত্য পদার্থ, তাহার আর কোনও কারণ নাই। আমরা যে যাবতীয় জড়পদার্থ দেখি, তাহা পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে।

লিউসিপ্পাস্—যিশুখৃষ্ট জন্মাইবার প্রায় ৪০০ বছর আগে গ্রীসে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচীন য়ুরোপে ইনিই প্রথম পরমাণুবাদ প্রচার করেন।

দেমোক্রিতাস্—লিউসিপ্পাসের প্রধান শিষ্য এবং ছন্দে ইনিই পরমাণুবাদকে বিশেষ ভাবে রূপ দেন। গ্রীক পরমাণুবাদের সঙ্গে সেই জন্য প্রধানতঃ দেমোক্রিতাসের নাম বিজড়িত। আকাশে ছায়াপথ যে অসংখ্য তারকায় পরিপূর্ণ—ইনিই প্রথম তাহা প্রচার করেন।

থিওফ্রেস্তাস্—(৩৭২—২৮৭ খৃঃ পূ) আরিষ্টটলের শিষ্য। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক পুস্তক ইনিই প্রথমে রচনা করেন। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব সম্বন্ধে ইনি দুইখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন—এক-খানির নাম On the History of Plants, দ্বিতীয় খানির নাম On the Causes of Plants. ইনি সর্ব্বেসমেত ৫০০ প্রকার বিভিন্ন গাছপালা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

হিরাক্লাইদিস্—গ্রীসের অন্তর্ভুক্ত পোণ্টাস শহরে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই প্রথম প্রচার করেন যে পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিম থেকে পূর্ব্বদিকে আপনার মেরুদণ্ডের উপর ঘুরিতেছে।

এরাটস্থিনিস্—আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ। খৃঃ পূঃ ২৭৫ বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন। অঙ্কশাস্ত্র-সম্মত ভূগোলের প্রবর্ত্তক। ইনিই প্রথম পৃথিবীর পরিধি সম্বন্ধে সেকালের সকলের চেয়ে সত্যের নিকটবর্ত্তী তথ্যে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন। ইনি পৃথিবীর পরিধি স্থির করেন ২৫২০০০ ষ্টাডিয়া। এক ষ্টাডিয়া আমাদের ৬০৬'৭৫ ফিট।

আপলোনিয়াস্—গ্রীসের অন্তর্ভুক্ত পার্গা শহরে খৃঃ পূ ২৬০ বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত জ্যামিতিকার। Conic Section সম্বন্ধে ৮ খণ্ডে সম্পূর্ণ ইঁহার পুস্তক প্রাচীনকালের উক্ত বিষয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ছিল।

হিরোফিলাস্—গ্রীসের কস নামক প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত চিকিৎসক হিপোক্রেতিসের প্রধান শিষ্য। শব-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। মস্তিষ্কের গঠন এবং শিরা-উপশিরার প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ প্রথম প্রচার করেন।

গালেন—খৃঃ পূঃ ১৩০ বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন। হিপোক্রেতিসের পর প্রাচীন য়ুরোপের সব চেয়ে বড় চিকিৎসক ও শারীর-তত্ত্ব-বিদ্ বলিয়া পরিগণিত। ইঁহার রচিত শারীর-তত্ত্ব বহু বৎসর ধরিয়া য়ুরোপের প্রামাণ্য-গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। ইনি রোম-সম্রাটের চিকিৎসক ছিলেন।

হাইপারকাস্—খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বেত্তা ইনি। ১০৮০টী তারার পরিচয় দিয়া একটী তালিকা তৈয়ারী করেন। ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাঁহার এই তালিকা সকলে অনুসরণ করিয়া আসে। ইনি Trigonometryর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

হেরণ—খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে জন্মগ্রহণ করেন। আর্কিমিডিসের পর ইনিই হইলেন প্রাচীন জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্র-নির্ম্মাতা। ইনি নানাবিধ যন্ত্র তৈয়ারী করেন। তাহার মধ্যে একটী ছোট বাষ্প-চালিত এঞ্জিন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেই জন্য বাষ্প-শক্তির প্রথম আবিষ্কর্ত্তা হিসাবে হেরণের নামই উল্লেখিত হয়।

টলেমী—খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতকে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পৃথ্বি-কেন্দ্রিক মত প্রতিষ্ঠা করেন। এবং কোপারনিকাস্ না আসা পর্য্যন্ত লোকে টলেমীর মতই সত্য বলিয়া মানিয়া চলে।

দিওফান্তাস্—আলেকজান্দ্রিয়া শহরে খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতকে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই পাশ্চাত্য জগতে প্রথম প্রাথমিক বীজ-গণিতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।

আর্য্যভট্ট—৪৮৬ খৃষ্টাব্দে পাটলীপুত্রে জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চ বীজগণিতের জন্মদাতা। ইঁহারই লিখিত গ্রন্থ হইতে আরব পণ্ডিতগণ হিন্দুসংখ্যা-গণন প্রণালী ও বীজগণিত আয়ত্ত করেন; এবং পরে আরবগণের নিকট হইতে য়ুরোপীয়রা বীজগণিতের দীক্ষা গ্রহণ করেন। ৭৭৩ খৃঃ অঃ সিন্ধুপ্রদেশ হইতে একদল হিন্দু বৈজ্ঞানিক বিখ্যাত খলিফা ও জ্ঞানপ্রচারক মনসুরের রাজসভায় গমন করেন।

মুসা—৮১৩ খৃঃ অঃ আরবে জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত আরব গণিতবিদ্ ও বীজগণিত-প্রণেতা। খলিফা মামুনের প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত লাইব্রেরীর ইনি ছিলেন অধ্যক্ষ। মুসার বীজগণিত হইতে য়ুরোপ বীজগণিতের দীক্ষা পায়।

লিওনার্দ্দো পিসানো—১১[illegible]৫ খৃঃ অঃ জন্মগ্রহণ করেন।

আফ্রিকার বার্ব্বারী প্রদেশে লালিতপালিত হন। কারণ তাঁহার পিতা সেখানকার বন্দরে কাজ করিতেন। সেইখানে আরব পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে ইনি বীজগণিত শিক্ষা করেন এবং পরে ইতালীতে ফিরিয়া আসিয়া য়ূরোপের প্রথম বীজগণিতের বিশিষ্টগ্রন্থ "Liber Abaci" প্রণয়ন করেন।

ভাস্করাচার্য্য—মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিড় নামক গ্রামে ১১১৪ খৃঃ অঃ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়া খ্যাত। ইঁহার রচিত পুস্তকের মধ্যে সিদ্ধান্তশিরোমণিই প্রধান। ইহা ৪ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের নাম, লীলাবতী-পাটী-গণিত ; দ্বিতীয় খণ্ডের নাম, বীজগণিত ; তৃতীয় খণ্ডের নাম—গ্রহগণিতাধ্যায় অর্থাৎ Astronomy ; চতুর্থ খণ্ডের নাম, গোলাধ্যায়। এই গোলাধ্যায়ে নিউটন জন্মিবার বহু বর্ষ পূর্ব্বে ভাস্করাচার্য্য মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া যান। অবশ্য তাহার বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও হেতুবাদ দিতে পারেন নাই। গণিতে ভগ্নাংশে দুটী সংখ্যা উপরে নীচে করিয়া রাখা এবং $\sqrt{}$ এই চিহ্ন ভাস্করাচার্য্যের সৃষ্টি।

সম্রাট জুষ্টিনিয়ন—ইনি বৈজ্ঞানিক নন। পরন্তু প্রাচীন য়ুরোপের বিজ্ঞান-সাধনার ইনি সকলের চেয়ে বেশী ক্ষতি করেন। ইঁহারই আদেশে ৫২৯ খৃঃ অঃ সমস্ত গ্রীক বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার ফলে য়ূরোপের জ্ঞানসাধনা কিছুকালের জন্য স্তিমিত হইয়া যায়। তারপর ৭৮৭ খৃঃ অঃ বিখ্যাত সম্রাট সারলেমান আসিয়া আবার স্কুলে স্কুলে গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চ্চার পথ খুলিয়া দেন। এই জ্ঞান-প্রচারের সাধনায় দুইজন পণ্ডিত তাঁহাকে সাহায্য করেন—একজনের নাম পিটার আর একজনের নাম আলকুইন।

আল হাজেন—বিখ্যাত আরব-বৈজ্ঞানিক। ৯৬৫ খৃঃ অঃ জন্মগ্রহণ করেন। মানুষের চক্ষুর গঠন এবং আলোক-তত্ত্ব সম্বন্ধে ইনি অনেক বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

ব্রহ্মগুপ্ত—৫৯৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জ্যামিতির ক্ষেত্রে বৃত্ত সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে ইনি বহু সমস্যা পরিপূরণ করেন।

উদয়ন—৯৭৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত ন্যায়শাস্ত্রবিদ্। উদ্ভিদ্-তত্ত্ব সম্বন্ধে উদ্ভিদের জীবন, মৃত্যু, নিদ্রা, ব্যাধি, ঔষধে সাড়া দেওয়া—এই সম্বন্ধে গবেষণা করেন।

গুণরত্ন—১৩৫০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ্। বৃক্ষের যৌন-জীবন সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন।

সুশ্রুত—হিন্দু আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। অনেকে বলেন যে, ইনি পৌরাণিক যুগের লোক—ঋষি বিশ্বামিত্রের পুত্র এবং ধন্বন্তরির শিষ্য। ঐতিহাসিকগণ বলেন, ধন্বন্তরি কাশীর রাজা ছিলেন এবং সুশ্রুত ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অস্ত্রোপচার বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

চরক—ভারতের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভেষজতত্ত্ববিদ্ এবং চিকিৎসক। ইনিও মুনি বলিয়া খ্যাত। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, ব্যাকরণের ভাষ্যকার পতঞ্জলি মুনিরই অপর নাম চরক। চরক এবং সুশ্রুতের রচিত আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থ ভারতের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

নাগার্জ্জুন—প্রাচীন ভারতের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসায়নবিদ্। ইঁহার পুস্তকের নাম রসরত্নাকর। নাগার্জ্জুন তাঁহার ইষ্ট-দেবীর নিকট

প্রার্থনা করেন—"আমি দ্বাদশবর্ষ কঠোর পরিশ্রম করিয়াছি। হে দেবি, যদি আপনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই তিনলোকে দুর্লভ রসায়ন-জ্ঞান প্রদান করুন।"

আবু ফজ্জার—আব্বাসবংশীয় খলিফাদের আমলে জন্মগ্রহণ করেন। মুসলমানদের মধ্যে ইনিই প্রথম দুরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

রোজার বেকন—১২১৪ খৃঃ অঃ ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ইংলণ্ডের সেই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। রসায়ন-শাস্ত্রে বহু গবেষণা করেন এবং যাদুকর বা মায়াবী বলিয়া দেশ হইতে বিতাড়িত হন। রোমে গিয়া পোপ চতুর্থ ক্লেমেণ্টের আদেশে বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনখানি পুস্তক রচনা করেন। এই তিনখণ্ড পুস্তকে তিনি তাঁহার পূর্ব্বাকার বৈজ্ঞানিক জগতের সমস্ত সিদ্ধান্তকে একত্র লিপিবদ্ধ করেন এবং বর্ত্তমান বিজ্ঞানসাধনার মূলতত্ত্ব যে, পরীক্ষা-মূলক অনুশীলন—তাহার বহুল প্রচার করেন। তিনি বলেন যে অঙ্কশাস্ত্র বা যন্ত্র দ্বারা স্থি: পরীক্ষিত না হইয়া কোনও বৈজ্ঞানিক সত্য গ্রাহ্য হইতে পারে না। তিনি ভবিষ্যৎবাণী করিয়া যান যে, এমন একদিন আসিবে যখন পাখা না থাকিলেও পাখীর মত মানুষ আকাশে উড়িবে, রাস্তা দিয়া অতি দ্রুতবেগে গাড়ী চলিবে, কিন্তু তাহাতে অশ্ব থাকিবে না এবং যন্ত্র-চ হইয়া সমুদ্রের উপর দিয়া জাহাজ যাতায়াত করিবে। চতুর্থ ক্লেমেণ্টে পর যে পোপ আসেন, তিনি বেকনকে যাদুকর বলিয়া কারারুদ্ধ করেন এবং মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বেকন কারাগারেই জীবন অতিবাহিত করেন।

ফ্লাবিও গিওজা—দ্বাদশ শতাব্দীতে ইটালীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই প্রথম য়ুরোপে দিগ্‌দর্শন-যন্ত্রের প্রচলন করেন।

গুটেন্‌বুর্গ—১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণীতে জন্মগ্রহণ করেন। সচল টাইপের দ্বারা মুদ্রনের রীতি ইনিই প্রথম আবিষ্কার করেন।

ল্যাণ্ডমান—১৫০৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ধাতু-তত্ত্ব সম্বন্ধে ইঁহারই রচিত পুস্তক বর্ত্তমানে ধাতু-তত্ত্বের প্রধান ভিত্তি।

উইলিয়াম গিলবার্ট—ইংলণ্ডের অন্তর্ভুক্ত কলচেষ্টার প্রদেশে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। চুম্বক-তত্ত্ব এবং বৈদ্যুতিকতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রথম বহু সত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ইঁহাকে বৈদ্যুতিক-বিজ্ঞানের জন্মদাতা বলা হয়।

পাচিওলি—১৪৫০ খৃষ্টাব্দে ইতালীর টাসকানী প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। য়ুরোপে পাটীগণিত ও বীজগণিত সম্বন্ধে প্রথম মুদ্রিত পুস্তক ইঁহারই রচনা। য়ুরোপীয় গণিতে $\surd$, +, −, এই সব চিহ্ন ইনিই ব্যবহার করেন।

গার্‌হার্ড ক্রামার—১৫১২ খৃঃ অঃ জার্ম্মাণীতে জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান জগতে বৈজ্ঞানিক ভূগোলতত্ত্বের ইনিই প্রতিষ্ঠাতা। বৈজ্ঞানিক [illegible]-অঙ্কন-বিদ্যা বর্ত্তমান জগতে ইনিই প্রবর্ত্তন করেন এবং [illegible]৯ খৃঃ অঃ প্রথম ইনি জগতের মানচিত্র প্রকাশ করেন।

হার্ভে—১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম চার্লসের চিকিৎসক ছিলেন। রক্তের চলাচল সম্বন্ধে গবেষণা দ্বারা চিকিৎসা-জগতে যুগান্তর আনেন।

জন নেপিয়ার—১৬১৪ খৃঃ অঃ ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। বীজগণিতে Logarithms গণন-প্রণালীর প্রবর্ত্তন করেন।

ক্রিশ্চিয়ান্ হুইগিন্স্—১৬২৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পেণ্ডুলাম-ওয়ালা ঘড়ির প্রথম প্রবর্ত্তন করেন।

রবার্ট বয়লি—১৬২৯ খৃষ্টাব্দে আয়ারল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। বায়ুমণ্ডলের চাপ ও বায়ুতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করেন। প্রথম Air-pump তৈয়ারী করেন।